www.BANGLAKITAB.com

ভরসায় থাকিলে আমি কোন উপকার করিতে পারিব না। হাঁ, নিজেও পুঁজি যোগাড় করিলে আমি উপকার করিতে পারিব।

সুতরাং বংশগত সম্পর্ক ও তাবার্‌রুকের কার্যকারিতা এতটুকুই যে, নিজের আমল ব্যতীত শুধু ইহাতে কোন লাভ নাই। অবশ্য নেক আমলসহ হইলে ইহার উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না। তাবার্‌রুক আদৌ উপকারী না হইলে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ ইহার প্রতি মনোযোগ দিতেন না। অথচ তাঁহারা এদিকে মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া বর্ণিত আছে। স্বয়ং হযরত (দঃ) আপন তাবার্‌রুক বিলাইয়াছেন। একবার তিনি জনৈক ছাহাবীকে আপন চাদর মোবারক দিয়া দেন। হজ্জের সময় তিনি আপন কেশ মোবারক বণ্টন করেন। অন্যান্য আরও ঘটনাবলী হইতে প্রমাণিত হয় যে, তাবার্‌রুক বাস্তবিকই উপকারী। তবে শুধু তাবার্‌রুক কোন কাজে আসে না। আসল পুঁজির সহিত ইহা যোগ হইলে উপকার অনেক বাড়িয়া যায়।

যেমন, খাদ্যের সহিত চাটনী, মোরব্বা ইত্যাদি থাকিলে খাদ্যের স্বাদ বাড়িয়া যায়। তাই বলিয়া কেহ যদি বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণকরত দস্তরখানে শুধু চাটনী ও মোরব্বা পরিবেশন করে, তবে ইহাকে নিমন্ত্রণ বলা হইবে না; বরং রসিকতা বলা হইবে।

তদ্রূপ যে সমস্ত বিষয় অতিরিক্ত, উহাদের উপর উদ্দেশ্য সিদ্ধি নির্ভরশীল নহে। তবে আসল বিষয়ের সহিত যোগ হইলে উহারা উপকারী হইয়া থাকে।। দাওয়াতের দস্তরখানে চাটনী মোরব্বা না থাকিলেও উহা দাওয়াত বলিয়া গণ্য হইবে; কিন্তু শুধু চাটনী মোরব্বা থাকিলে এবং খাদ্য না থাকিলে উহাকে দাওয়াত বলিয়া গণ্য করা হইবে না। আর যদি উভয়টি মওজুদ থাকে, তবে উহা সুস্বাদু ও উচ্চমানের দাওয়াত হইবে।

তাবার্‌রুক উপকারী হওয়ার তাৎপর্যঃ তাবার্‌রুক অবশ্যই উপকারী। তবে ইহার জন্য কয়েকটি শর্ত আছে। (অর্থাৎ, ঈমান ও নেক আমল) সরকার আপন অনুগতদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেন। কিন্তু কখন? যখন তাহারা বিদ্রোহ কিংবা অপরাধের প্রশ্রয় না লয় এবং সুশিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সরকারের আনুগত্য করে। এমতাবস্থায় অন্যের তুলনায় তাহাদের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখা হয়। এই কারণে পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ বুযুর্গদের নেক সন্তানের সর্বদাই সম্মান করিয়াছেন। ঘটনাবলী সাক্ষ্য দেয় যে, স্বয়ং বুযুর্গগণও আপন সন্তানদিগকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন।

আমার জনৈকা ফুফী বালিকাদিগকে পড়াইতেন। আমাদের পরিবারে বালিকাদিগকে বাড়ীতেই লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে। তাহাদের জন্য পৃথক কোন বালিকা-বিদ্যালয় নাই। থাকা সঙ্গতও নহে। (ইহাতে অনেক অনর্থ দেখা দেয়। অভিজ্ঞতা দ্বারা ক্রমশঃই ইহা প্রমাণিত হইতেছে।) আমার ফুফী সাহেবাও তদ্রূপ বাড়ীতেই মেয়েদিগকে পড়াইতেন এবং এজন্য কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না। একবার তাঁহার নিকট জনৈকা সৈয়দ বংশীয়া বালিকা পড়িতে আসে। ফুফী বলেনঃ ঐ রাত্রিতেই আমি হযরত ফাতেমা (রাঃ)-কে স্বপ্নে দেখিলাম। তিনি বলিতেছেনঃ "ওমদাতুন্নেছা, আমার এই মেয়েটিকে আদর করিয়া পড়াইবে।"

এমনি ধরনের আরও অনেক স্বপ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বুযুর্গগণ আপন সন্তানদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখেন। আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলা বুযুর্গদের সন্তানদিগকে বুযুর্গদের সমমর্যাদায় উন্নীত করিয়া দিবেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ

www.BANGLAKITAB.com

"যাহারা ঈমান আনে এবং তাহাদের বংশধরগণও তাহাদের অনুসরণ করিয়া ঈমান আনে, (অর্থাৎ, কাফের কিংবা ফাসেক না হয়) আমি তাহাদের বংশধরদিগকেও তাহাদের সহিত মিলাইয়া দিব। (অর্থাৎ, উভয়ের আমল সমান না হইলেও উভয়কে সমান মর্যাদা দিয়া দিব)" যেমন, কোন বাদশাহ্ পুত্রসহ কোথাও মেহমান হইলে পুত্র পিতার সহিত একই স্থানে অবস্থান করে।

এক্ষণে সমমর্যাদা দানের অর্থ কেহ এইরূপ মনে করিতে পারে যে, উচ্চ মর্যাদাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে নীচে আনা হইবে কিংবা তাঁহার মর্যাদা সামান্য হ্রাস করা হইবে এবং নিম্ন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির মর্যাদা বাড়াইয়া উভয়কে গড়ে সমমর্যাদা দেওয়া হইবে। এই সন্দেহ খণ্ডনের নিমিত্ত আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

وَمَآ اَلَتْنَا لَهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ

"আর আমি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির আমল বিন্দুমাত্র হ্রাস করিব না।" অতএব, বুঝা গেল যে, যাহারা কম আমল করিবে, তাহাদের আমল বাড়াইয়া দিয়া পূর্ণ আমলকারীদের সহিত মিলাইয়া দেওয়াই সমমর্যাদা দানের তাৎপর্য।

ইহা শুনিয়া হয়তো কেহ আনন্দিত হইবে যে, তবে আমাদের আমল করার প্রয়োজন নাই। তাই সঙ্গেসঙ্গেই এই ধারণার খণ্ডন করিয়া বলেনঃ

كُلُّ امْرِىءٍ بِمَاكَسَبَ رَهِيْنٌ

"প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজস্ব আমলের সহিত জড়িত থাকিবে।" সুতরাং আমলের প্রয়োজন আছেই। আমল ব্যতীত সমমর্যাদা লাভ হইবে না।

বংশমর্যাদার মূল্যঃ বংশমর্যাদা উপকারী কিনা, উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এই প্রশ্নের সমাধান হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে এই ব্যাপারে খুবই বাড়াবাড়ি চলিতেছে। অনেকে বংশমর্যাদাকেই বড় মূলধন মনে করিতেছে। আবার অনেকে ইহাকে 'কিছুই নহে' বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিতেছে। যাহারা উচ্চ বংশধর নহে, সাধারণতঃ তাহারাই ইহাকে উড়াইয়া দেয়। বলিতে কি, উভয় পক্ষই অহংকারের বশবর্তী হইয়া এরূপ করিতেছে। যাহারা ইহাকে প্রকৃত মূলধন মনে করে, তাহারা ইহা দ্বারা অন্যের কাছে এই বলিয়া বড় হইতে চায় যে, আমরা এতবড় মর্যাদার অধিকারী। কাজেই আমাদিগকে বড় মনে কর। অপরপক্ষে যাহারা ইহাকে উড়াইয়া দেয়, তাহারাও মনে মনে এইরূপ দাবী করে, আমরা সম্ভ্রান্ত লোকদের তুলনায় কোন অংশে হেয় নহি। কারণ, বংশমর্যাদা কোন জিনিসই নহে। এই দ্বন্দ্বের ফলে অনেকে বংশমর্যাদাকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া দিয়াছে। আবার অনেকে টানা-হেঁছড়া করিয়া নিজদিগকে সম্ভ্রান্ত বংশের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছে।

আমি এক জায়গায় গিয়াছিলাম। সেখানকার নীচ জাতিরা নিজদিগকে চারি ভাগে ভাগ করিয়া লইয়াছিল। (১) শায়খ, (২) সৈয়দ, (৩) মোগল ও (৪) পাঠান। তাহারা আপন মহল্লার নামও পাল্টাইয়া দিয়াছিল। আমি এই মহল্লার নাম প্রকাশ করিতে চাই না। তথায় পৌঁছিলে মহল্লাবাসীরা আমাকে কিছু বয়ান করিতে অনুরোধ করিল। ঘটনাক্রমে আমি বংশমর্যাদা সম্বন্ধেই বর্ণনা আরম্ভ করিলাম। (অথচ আমি তখন পর্যন্ত উপরোক্ত ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানিতাম না। কেহ আমাকে জানায়ও নাই।) আমার বর্ণনা শুনিয়া তাহারা যারপরনাই অসন্তুষ্ট হইল। তাহারা বলিতে লাগিল, "এছাড়া কি অন্য কোন আলোচ্য বিষয় ছিল না?" তাহাদের ধারণা ছিল, তথাকার শায়খ বংশের লোকেরা ফরমায়েশ করিয়া এই বিষয়টি বর্ণনা করাইয়াছে। ফলে শায়খের প্রতিও তাহারা

www.BANGLAKITAB.com

ভীষণ চটিয়া গেল। অথচ ফরমায়েশী বিষয়বস্তু বর্ণনা করার অভ্যাস আমার আদৌ নাই। উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা উদয় হয়, তাহাই বর্ণনা করিয়া দেই।

মোটকথা, বংশমর্যাদা সম্পর্কে উপরোক্তরূপ বাড়াবাড়ি চলিতেছে। ইহার কারণ অহঙ্কার ছাড়া কিছুই নহে। যাহারা শক্তিমান, তাহাদের অহঙ্কার পরিষ্কার ফুটিয়া উঠে। আর যাহারা দুর্বল, তাহাদের ব্যবহারে ইহা ধরা পড়ে।

একদা আমি কান্ধলা নামক একটি ছোট শহরে গিয়াছিলাম। তথায় জনৈক নাপিত প্রকাশ্য মজলিসে আমাকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, যাহারা 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিলে ক্ষেপিয়া উঠে—তাহারা কেমন? যাহাদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া লোকটি প্রশ্ন করিল, তাহারাও মজলিসে উপস্থিত ছিল। প্রশ্ন শুনিয়া তাহাদের কপালে ঘর্ম দেখা দিল। না জানি কি ফতওয়া লাগে। আমি বলিলাম, "যাঁহারা এরূপ করে, নিঃসন্দেহে তাহারা মন্দ লোক। কিন্তু যাহারা পারস্পরিক সাম্যতা বুঝাইবার নিয়তে 'আস্‌সালামু আলাইকুম'কে লম্বা করিয়া লাঠির ন্যায় ছুড়িয়া মারে, তাহারা আরও অধিক মন্দ লোক। ছোটরা বড়দিগকে সালাম করার নিয়ম নম্রতা সহকারে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলা। লাঠির ন্যায় ছুড়িয়া মারা উচিত নহে। পিতাপুত্রের সালামের ন্যায় সালাম করিলে কেহ ক্ষেপিবে না।"

প্রশ্নকারী চলিয়া গেলে উপস্থিত সম্ভ্রান্ত লোকগণ হাসিয়া বলিতে লাগিলেন, "বস্ জনাব, আপনি এদের আসল রোগ ধরিতে পারিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহারা সাম্যতা প্রদর্শনার্থে লাঠি ছোড়ার ন্যায় সালাম করে। ইহা আমাদের কাছে খুবই বিরক্তিকর মনে হয়। ভদ্রতার সহিত সালাম করিলে ক্ষেপার কোন কারণ নাই।" সুতরাং ধনীদিগকে অহঙ্কারী বলা হইলেও গরীবরা এ ব্যাপারে পশ্চাতে নহে।

ইহার বিপরীতে আরও একটি গল্প মনে পড়িল। জনৈক নাপিত কাহারও চিঠি লইয়া এক ছোট শহরে পৌঁছিল। তথায় শায়খ পরিবারের লোকদিগকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলায় তাহারা তাহাকে ধরিয়া খুব প্রহার করিল। বেচারা মার খাইয়া কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিল, "হুযূর! তবে কি বলিব?" তাহারা বলিল, "হযরত সালামত" বলিবে। এরপর জুমুআর নামাযে ইমাম যখন 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্' বলিলেন, তখন ঐ নাপিত সজোরে বলিতে লাগিল, "হযরত সালামত ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্, হযরত সালামত ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ্।"

ইমাম সাহেব তাহাকে ডাকিয়া বলিলেনঃ "একি অদ্ভুত কথা!" সে বলিল, "হুযূর! আগে আমার কাহিনী শুনিয়া লউন। আমি এখানকার বিশিষ্ট লোকদিগকে 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলায় তাহারা আমাকে বেদম প্রহার করিয়াছে। অবশেষে তাহারাই আমাকে সালামের স্থলে "হযরত সালামত" বলিতে শিখাইয়া দিয়াছে। নামাযের মধ্যে আমার আশঙ্কা হইল যে, ফেরেশতারাও যদি 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলিলে রাগান্বিত হয়, তবে আমার সর্বনাশ। কারণ, তাহাদের মধ্যে একজন মৃত্যুর ফেরেশতাও রহিয়াছেন। তিনি আমার প্রাণ বাহির করিয়া তবে ছাড়িবেন। এই কারণে আমি নামাযের মধ্যেও সালামের পরিবর্তে 'হযরত সালামত' বলিয়াছি।" এরপর ইমাম সাহেব তথাকার বিশিষ্ট লোকদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "একি বাজে কথা, আপনারা সুন্নত পালন করিতেও নিষেধ করিতেছেন।" মোটকথা, কিছু সংখ্যক লোক এমনও আছে।

আরও একটি গল্প মনে পড়িল। কানপুরে অবস্থান কালে গ্রাম হইতে জনৈক কাজী সাহেব আমার নিকট আসিলেন। তিনি আস্‌সালামু আলাইকুম বলিয়া নিকটেই বসিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ

www.BANGLAKITAB.com

পর বলিলেন, "কিছু আরয করিতে চাই।" আমি বলিলাম, "স্বচ্ছন্দে বলুন।" কাজী সাহেব অভিযোগের ভঙ্গিতে বলিতে লাগিলেন, "আমাদের এলাকায় ভদ্র ও সাধারণ একেবারে বরাবর হইয়া গিয়াছে। এত দিন 'আস্‌সালামু আলাইকুম'-এর একটি পার্থক্য ছিল। কিন্তু এখন মৌলবীরা ইহাও উঠাইয়া দিয়াছে। সকলের জন্য একই 'আস্‌সালামু আলাইকুম'। আমি বলিলাম, কাজী সাহেব! ভদ্র ও সাধারণের পার্থক্য ধর্মীয় বিষয়ে, না সাংসারিক বিষয়ে? যদি ধর্মীয় বিষয়ে হয়, তবে গ্রামে যাইয়া সাধারণ লোকদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন যোহ্‌র, আছর ও এশার নামায তিন রাকাআত করিয়া পড়ে। (এবং মাগরেবে দুই ও ফজরে এক রাকআত পড়ে।) তাহারা ইহাতে স্বীকৃত না হইলে আপনারা চারি রাকাআতের স্থলে পাঁচ এবং তিন-এর স্থলে চারি রাকাআত করিয়া পড়িতে আরম্ভ করুন। ইহাতে ভদ্র ও সাধারণের সাম্য বাকী থাকিবে। ইহা শুনিয়া কাজী সাহেব চুপ হইয়া গেলেন।

আমি আরও বলিলাম, বলুন তো, 'আস্‌সালামু আলাইকুম' ধর্মীয় কাজ, না সাংসারিক কাজ? জানা কথা, ইহা ধর্মীয় কাজ। তবে ইহাতে বড় ছোট-এর পার্থক্য থাকিবে কেন? সাংসারিক ব্যাপারে পার্থক্য করিলে আমরা বাধা দেই না। আপনারা মজলিসের সম্মুখে বসেন আর দরিদ্ররা পিছনে বসে—এই পার্থক্যই যথেষ্ট। কোন সাধারণ ব্যক্তি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া বড়দের সারিতে বসিতে চাহিলে আমরা তাহাকে অবশ্যই বিরত রাখিব।

মোটকথা, বংশগত সম্পর্কের ব্যাপারে উভয় পক্ষ হইতে বাড়াবাড়ি হইতেছে। একদল ইহাকেই যথাসর্বস্ব মনে করে এবং অপর দল ইহাকে একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেয়। এই কারণে আমি উক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী ইহার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি জিজ্ঞাসা করি, বর্তমানে যাহারা সমাজে সম্ভ্রান্ত এবং নিজদিগকে ছিদ্দীকী, ফারূকী ও সৈয়দ আখ্যায় আখ্যায়িত করে, তাহারা বলুক, তাহাদের পূর্ববর্তিগণ সম্ভ্রান্ত হইলেন কিরূপে? উত্তর হইবে, তাহারা পূর্ণ ধার্মিক ছিলেন। এই কারণে এখন তাহাদের সহিত সম্পর্ক থাকাও সম্ভ্রান্ত হওয়ার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ধার্মিক ও ঈমানদার হওয়াই সম্ভ্রান্ত হওয়ার আসল কারণ। আমাদের পূর্ববর্তিগণও এই কারণেই সম্ভ্রান্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের সহিত সম্পর্কের ফলে আমরাও সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত। অবশ্য তৎসঙ্গে তাঁহাদের বংশও উচ্চ ছিল। তবে শুধু উচ্চ বংশ হওয়াই সম্ভ্রান্ত হওয়ার কারণ নহে। যেমন, আবু জাহ্‌ল ও আবু লাহাবও উচ্চ বংশোদ্ভূত ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত হইতে কেহই রাযী হইবে না; বরং ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহারা পূর্ণতা প্রাপ্ত ছিলেন, এজন্য তাঁহাদের সাথে সম্পর্কিত হওয়াতে শরাফত আসিয়া গিয়াছে। তবে বংশগত মর্যাদা একেবারে অসার নহে। শরীঅতের দৃষ্টিতে দুনিয়া ও আখেরাতে উভয়স্থলে ইহা স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

হাদীস শরীফে 'কুফূ' অর্থাৎ বংশ, পেশা ও ধনদৌলত সমতুল্য ব্যক্তির সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে বলা হইয়াছে। এইভাবে দুনিয়াতে বংশমর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। শরীঅতের দৃষ্টিতে কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা অসম্ভ্রান্ত পুরুষের সমতুল্য নহে। আখেরাতের বেলায়ও যে ব্যক্তি এরূপ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সন্তান হইবে, সে ঈমান আনিলে ও নেক আমল করিলে অন্যের অপেক্ষা বেশী সওয়াব পাইবে এবং আপন পূর্ববর্তী বুযুর্গদের সমপরিমাণ আমল না থাকিলে সে জান্নাতে তাঁহাদের স্তরে অবস্থান করিবে। এই উপকারটি শুধু সাধারণের নিকট সম্ভ্রান্ত বলিয়া গণ্য ব্যক্তিদের জন্যই নহে; বরং কোন জোলাও খোদার ওলী হইলে তাহার

www.BANGLAKITAB.com

ছেলেও এইরূপ উপকার প্রাপ্ত হইবে। মোটকথা, আভিজাত্যে আখেরাতেরও উপকার আছে। তবে ইহা পারিভাষিক অভিজাতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে; বরং যে কেহ খোদার প্রিয়পাত্র হইবে, তাহার সহিত সম্পর্ক থাকাই উপকারী হইবে।

সুতরাং বংশমর্যাদার উপকার অস্বীকার করা নিতান্ত ভুল। আখেরাতে অভিজাত ও অনভিজাতের মধ্যে উপরোক্তরূপ পার্থক্য হইবে। দুনিয়াতেও এতদুভয়ের পার্থক্য বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে প্রকাশমান। তাছাড়া, (জ্ঞান বুদ্ধি) তাহ্‌যীব-তামাদ্দুন ইত্যাদির দৃষ্টিতেও অভিজাত ও অনভিজাতের পার্থক্য সুস্পষ্ট।

তাই বলিয়া অন্যকে হেয় জ্ঞান করিবেন না। এই পার্থক্যটিকে ছোট ভাই ও বড় ভাই, পিতা ও পুত্র এবং রাজা ও প্রজার পার্থক্যের ন্যায় মনে করিবেন। বড় ভাই ছোট ভাইকে কিংবা পিতা পুত্রকে কখনও হেয় মনে করিতে পারে? বংশমর্যাদার বাড়াবাড়ি সম্পর্কে এই হইল মীমাংসা।

ইহা একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা হইয়া গেল। আসলে আমার বক্তব্য ছিল যে, শুধু বংশগত সম্পর্কই যথেষ্ট নহে; বরং তৎসঙ্গে ঈমান ও নেক আমলও থাকিতে হইবে। اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ 'যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের সন্তানসন্ততিও ঈমানের ব্যাপারে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছে,' আয়াত হইতেও এই বক্তব্য পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে। সুতরাং আমরা বুযুর্গদের সন্তান, আমাদের নিকট তাঁহাদের তাবার্‌রুক আছে ইত্যাদি বলিয়া কাহারও আত্ম-তুষ্টি লাভ করা উচিত নহে; বরং ঈমান ও নেক আমলের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। তাহা হইলেই বংশগত সম্পর্ক কাজে আসিবে—নতুবা নহে।

এই বক্তব্যটি اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝ 'নিশ্চয়ই যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও নেক কাজ করিয়াছে, আল্লাহ্ সত্বরই তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করিবেন' এই আয়াত হইতেও বুঝা যায়। ইহাতে ঈমান ও নেক আমলকেই বন্ধুত্ব প্রাপ্তির বুনিয়াদ বলা হইয়াছে। সুতরাং এই দুইটি ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ই মূল বুনিয়াদ নহে; বরং অতিরিক্ত বিষয়ের মধ্যে গণ্য। মোটকথা, আয়াতের প্রথমাংশেই উদ্দেশ্য হাছিলের পন্থা বর্ণিত হইয়াছে। উহা দুই ভাগে বিভক্ত। একটি ঈমান ও অপরটি নেক আমল। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমি নেক আমলেরই ব্যাখ্যা করিতে চাই। ঈমানের ব্যাখ্যার জন্য আকায়েদের অধ্যায় দেখা দরকার। যাবতীয় আকায়েদের ব্যাখ্যা করিলে এইরূপ একটি সভা যথেষ্ট নহে। তবুও আমি আকায়েদের পূর্ণ ব্যাখ্যা না করিয়া ইহার কয়েকটি প্রাথমিক প্রকার বর্ণনা করিয়া দিতেছি। আজকাল মানুষ এগুলির মধ্যেই অধিকতর বিভ্রান্ত হইতেছে।

আকায়েদের ভুল-ভ্রান্তিঃ আজকাল আকায়েদের ব্যাপারে দুই প্রকার ভ্রান্তি হইতেছে। একদল লোক শুধু ঈমান ও আকায়েদকেই জরুরী মনে করে। তাহারা আমলের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে না। তাহাদের সাধারণ বিশ্বাস— مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এই কলেমা উচ্চারণ করে এবং তওহীদ ও রেসালাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, সে জান্নাতে যাইবে। তাহার পক্ষে আমল করার প্রয়োজন নাই।

অপর একদল লোক ঈমানের মধ্যেও ছাটাই করিয়া ফেলিয়াছে। ঈমানের আসল স্বরূপ হইল— اَلتَّصْدِيْقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'হযরত (দঃ) যে যে বিষয়সহ আবির্ভূত হইয়াছেন, তাহা সমস্তই সর্বান্তকরণে মানিয়া লওয়া। তিনি বলিয়াছেনঃ আল্লাহ্ এক। কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী। আমলের ওযন সত্য। হিসাব-নিকাশ সত্য। জান্নাত ও দোযখ সত্য।

www.BANGLAKITAB.com

তক্‌দীর সত্য। ফেরেশতাদের অস্তিত্ব সত্য, পুলসিরাত অতিক্রম করা সত্য। এতদ্ব্যতীত নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি ফরয হওয়া সত্য। এগুলি যদিও আমলের অন্তর্ভুক্ত, তাসত্ত্বেও এইগুলি ফরয বলিয়া স্বীকার করা ঈমানের অঙ্গ। অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত যদিও আমলের সহিত সংশ্লিষ্ট; কিন্তু ইহা ফরয বলিয়া বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ। এই বিশ্বাস ব্যতীত ঈমানের অস্তিত্বই হইতে পারে না।

এই সমস্ত বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমান। কিন্তু একদল লোক এগুলির মধ্যে ছাটাই করিয়া আমল ওযনের প্রতি বিশ্বাস করা জরুরী মনে করে না। কেহ পুলসিরাত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাকে ঈমানের অঙ্গ মনে করে না। আবার কেহ তক্‌দীর ইত্যাদিকে অস্বীকার করা সত্ত্বেও নিজকে মুসলমান বলিয়া দাবী করে।

কিছুদিন পূর্বেও এই সমস্ত আকায়েদে মতভেদ ছিল না। তবে শাখা-প্রশাখায় মতভেদ ছিল। মতভেদ দুই প্রকার। (১) যে সব বিষয়ে মতভেদ করার সুযোগ আছে—উহাতে মতভেদ করা। অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নহে—এরূপ শাখা-প্রশাখায় এই প্রকার মতভেদ হইয়া থাকে। যেমন, মুজতাহিদগণ ও তাঁহাদের অনুসারীদের মধ্যে এই প্রকার মতভেদ হইয়াছে। এ সমস্ত মতভেদ শুধু আমলের ক্ষেত্রে হইয়াছে, আকায়েদের ক্ষেত্রে সকলেই ছিলেন একমত। আকায়েদেও মতভেদ হইয়া থাকিলে তাহা অপ্রধান শাখা-প্রশাখায় হইয়াছে। পূর্বে যে সব বিষয়ে সন্দেহও ছিল না, দুঃখের বিষয়, এই যুগে ঐ সব বিষয়েও মতভেদ শুরু হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে নব্য শিক্ষার বদৌলতে এবং ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে প্রধান আকায়েদেও মতদ্বৈধতা হইতেছে। ধর্মের প্রতি মহব্বত ও আলেমদের সংসর্গ না থাকাও ইহার অন্যতম কারণ।

অনিষ্টের কারণঃ আমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে যদিও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যাপক ছিল না এবং তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক ২।৪।১০ জন লোকই আলেম ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে অত্যন্ত উপকারী দুইটি গুণ ছিল। একটি ধর্মের প্রতি মহব্বত ও অপরটি আলেমদের সংসর্গ লাভ। বর্তমান যুগের মুসলমান ভাইগণ ধর্মীয় শিক্ষা বর্জন করার সঙ্গেসঙ্গে এই দুইটি গুণও বর্জন করিয়াছেন। বলিতে কি, ইহাই আমাদের যাবতীয় অনিষ্টের মূল। চিকিৎসকের কাছে না গেলে কেহ আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি সুস্থতা লাভের আকাঙ্ক্ষী, সেই চিকিৎসকের কাছে যায়। আজকাল মুসলমান ভাইদের মনে প্রকৃতপক্ষে ধর্মের প্রতিই টান নাই। এই কারণে তাহারা ধর্মীয় চিকিৎসকদের কাছে যায় না। ফলে তাহাদের ঈমান ও ধর্ম বিভিন্ন প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেছে, অথচ তাহারা মোটেই টের পাইতেছে না। রোগী আপন রোগ টের পায় না, ইহার ন্যায় মারাত্মক অনিষ্ট আর কি হইতে পারে? এই প্রকার রোগী যদি সুস্থ ব্যক্তিকে রোগী মনে করে, তবে ইহা আরও সর্বনাশের কথা। জনৈক নাক-কান কাটা ব্যক্তি নাকবিশিষ্ট লোকদিগকে 'নাকী' বলিয়া ডাকিত। মুসলমান ভাইদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাহারা প্রাচীন কামেল ঈমানদার ব্যক্তিদিগকে সুস্থ তো মনে করেই না; উপরন্তু তাঁহাদের নামে বিভিন্ন অপবাদ রটনা করে, যদ্দরুন তাহাদিগকে এইসবের খণ্ডনে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। অদ্ভুত উল্টা যমানা বটে!

বন্ধুগণ! প্রাচীন লোকদের মধ্যে যে গোনাহ্‌গার ও ফাসেক ছিল না এমন নহে। তবে তাহারা আলেমদের সম্মুখে মাথা নত করিয়া ফেলিত। পারলৌকিক শাস্তির ভয় প্রদর্শন করিলে তাঁহারা ভীত হইয়া পড়িত। তাহারা নিজদিগকে ধর্ম বিষয়ে মতামতের অধিকারী মনে করিত না। ফলে তাহাদের ঈমান নিরাপদ ছিল। অপর পক্ষে যেখানে নব্যশিক্ষার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে এবং

www.BANGLAKITAB.com

শিক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করা হইয়াছে, সেখান হইতে ঈমান বিদায় নিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাদের মনে না ধর্মের প্রতি টান আছে, না ধার্মিকদের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। প্রত্যেকেই ধর্মীয় ব্যাপারে নিজেকে মতামতের অধিকারী মনে করে। মাসআলা মাসায়েলের ব্যাপারে তাহারা আলেমদের সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হয়। হাঁ, নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি যদি ধর্মের প্রতি টান রাখে এবং বুযুর্গদের সহিত উঠাবসা করে, তবে তাঁহার ঈমানের কোনরূপ ক্ষতি হইতে পারে না। এরূপ ব্যক্তির মধ্যে দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টির সমাবেশ ঘটে। এই প্রকার মহব্বত ও ধর্মীয় শিক্ষা সম্বন্ধে কবি বলেনঃ

دریں زمانہ رفیقے کہ خالی از خلل است ـ صراحی مے ناب وسفینہ غزل است

(দরীঁ যমানা রফীকে কেহ খালী আয খলল আস্ত + ছোরাহী মায়ে নাব ও সফিনায়ে গযল আস্ত)

"এই যমানায় নির্দোষ সঙ্গী হইল খোদার মহব্বত ও দ্বীনী শিক্ষা।"

صراحی مے ناب 'দ্বারা মহব্বত বুঝান হইয়াছে।' ইহা কবির নিজস্ব পরিভাষা। سفینہ غزل বলিয়া ধর্মীয় শিক্ষা বুঝান হইয়াছে। ইহা লাভ করার এক উপায় হইল মাদ্রাসায় পড়া। ইহা সম্ভব না হইলে বুযুর্গদের সহিত উঠাবসা করা। ইহাও সম্ভব না হইলে ধর্মীয় পুস্তক পাঠ করা। তবে আলেমদের সংসর্গে থাকিয়া দৈনন্দিন পাঠ হিসাবে না পড়িলে শুধু পুস্তক পাঠ করিয়াই ধর্মের বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা যায় না; যদিও তাহা উর্দু বা বাংলা ভাষায় লিখিত থাকে। যেমন, চিকিৎসকের নিকট না পড়িয়া কেহ শুধু উর্দু বা বাংলা ভাষায় লিখিত চিকিৎসা শাস্ত্রের পুস্তক পাঠ করিয়া প্রকৃত চিকিৎসক হইতে পারে না।

বর্তমান যুগের মানুষ এত বিভিন্ন ধরনের পুস্তক পাঠ করে যে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। যে কোন বিষয়ের পুস্তক চোখের সম্মুখে পড়ুক, অমনি তাহা পাঠ আরম্ভ করিয়া দেয়। লেখক সুবিজ্ঞ, কি অবিজ্ঞ সে দিকে মোটেই ভ্রুক্ষেপ করে না। বিভিন্ন জনের লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া আবার তাহারাই ইহার সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দেয় যে, এই বিষয়টি অমুক অপেক্ষা অমুকে ভাল লিখিয়াছে। আরও বিপদ এই যে, তাহারা নিজেদের এই সিদ্ধান্তকে নির্ভরযোগ্যও মনে করে। জিজ্ঞাসা করি, সরকারী আইন না জানিয়াই যদি কেহ মোকদ্দমার ফয়সালা দেয়, তবে তাহার ফয়সালা নির্ভরযোগ্য হইবে কি? কখনই নহে। সুতরাং যে ব্যক্তি খোদার আইন-কানূন সম্বন্ধে অজ্ঞ তাহার সিদ্ধান্তকে নির্ভরযোগ্য মনে করা বিস্ময়ের কথা বটে। এরূপ হইলে উকিল ব্যারিষ্টারের কোন প্রয়োজন থাকিত না। প্রত্যেকেই আইনের পুস্তক দেখিয়া মোকদ্দমার ফয়সালা করিতে পারিত। এক্ষেত্রে সকলেই একমত যে, সরকারী আইন বুঝা সকলের কাজ নহে; বরং যে ব্যক্তি রীতিমত ইহা অধ্যয়ন করে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, একমাত্র তাহারই অভিমত নির্ভরযোগ্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, খোদার আইন-কানূনের বেলায় কোন পরীক্ষা বা ডিগ্রী লাভ করা প্রয়োজনীয় মনে করে না। যে কেহ এ ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করিতে ব্যগ্র হইয়া পড়ে। উর্দু ভাষায় লিখিত দুই চারিটি পুস্তক পাঠ করিয়াই তাহারা শরীঅতের ব্যাপারে মত প্রকাশে প্রস্তুত হইয়া যায়। কোন ব্যাপার বিবেকের আওতায় না পড়িলেই তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া বসে। বিবেকই হইল তাহাদের মতে একমাত্র মাপকাঠি। যেমন, জনৈক উস্তাদ তাহার একজন নির্বোধ শিষ্যকে শিখাইয়া দিয়াছিলঃ "তোমাকে কেহ কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করিলে যদি জানা থাকে, বলিয়া দিও। আর জানা না থাকিলে 'ইহাতে মতভেদ আছে' বলিয়া দিও। (এইরূপে মূর্খতা প্রকাশ পাইবে না।) জিজ্ঞাসাকারী মনে করিবে যে, তুমি মাসআলা জান, কিন্তু মতভেদের কারণে

www.BANGLAKITAB.com

একদিক নির্দিষ্ট করিতেছ না। যেহেতু প্রচুর সংখ্যক মাসআলার মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে, এই কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তোমার এই উত্তর নির্ভুল হইবে।" কিন্তু শিষ্যটি নিরেট বোকা হওয়ার কারণে কতক সর্ব-বাদিসম্মত মাসায়েলের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত উত্তর দিল। ফলে শেষ পর্যন্ত তাহার নির্বুদ্ধিতা গোপন রহিল না।

আত্ম-প্রীতি দোষঃ তেমনি মুসলমান ভাইগণও একটি নীতি মুখস্থ করিয়া লইয়াছে। অর্থাৎ, কোন ব্যাপার বোধগম্য না হইলেই উহাকে বিবেক বহির্ভূত আখ্যা দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়। ফলে তাহারা কোরআন ও হাদীসের অর্থ পরিবর্তন করিতে দ্বিধা করে না। তাহাদের মতে পুলসিরাত ও অন্যান্য যাবতীয় মো'জেযা বিবেক বহির্ভূত। এইভাবে তাহারা আকায়েদের অধ্যায়ে ছাটাই আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাহাদের মতানুযায়ী ঈমানের পূর্বোল্লিখিত অর্থ শুদ্ধ নহে; বরং ঈমানের অর্থ হইল হযরত (দঃ)-এর বর্ণিত ঐ সমস্ত বিষয় মানিয়া লওয়া, যাহা তাহাদের বিবেকের আওতাধীন।

আমি তাহাদিগকে একটি প্রশ্ন করিতেছিঃ শরীঅতে যে সমস্ত বিষয় বিবেক বিরুদ্ধ রহিয়াছে, উহা কাহার বিবেকের বিরুদ্ধ? আপনাদের, না সকল বুদ্ধিমান চিন্তাবিদদের? সমস্ত চিন্তাবিদদের বিবেকের বিরুদ্ধ হওয়া স্বীকার করি না। কেননা, প্রগাঢ় জ্ঞান ও বিবেকসম্পন্ন আলেমগণ এইগুলিকে বিবেক-বিরুদ্ধ আখ্যা দেন না। তাঁহারা সর্বকালেই এই সমস্ত বিষয় হুবহু শরীঅতের বর্ণনা অনুযায়ী স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। তাই ছাহাবা, তাবেয়ীন ও অন্যান্য জ্ঞানী মনীষিগণ প্রকাশ্য অর্থ অনুযায়ী ঐগুলি বিশ্বাস করিয়াছেন। অপর পক্ষে যদি বলেন যে, আপনাদের বিবেকের বিরুদ্ধে, তবে ইহা অস্বীকার করি না; কিন্তু আপনাদের বিবেকের বিরুদ্ধে হইলে ঐ সমস্ত বিষয় ভুল ও অগ্রহণীয় হইবে, তাহা স্বীকার করা যায় না। কেননা, অনেক সরকারী আইন আপনাদের বিবেক বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও আইনবিদদের উপর নির্ভর করিয়া আপনারা তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন।

আমি আরও জিজ্ঞাসা করি, মায়ের গর্ভ হইতে আপনারা যেভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ আপনাদের বিবেকের আওতাধীন? তবে যেহেতু দিবারাত্র আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করি, এই কারণে আমরা ইহাতে বিস্ময় বোধ করি না। দিবারাত্র প্রত্যক্ষ না করিলে এবং শুধু বর্ণনা মারফত বিষয়টি বুঝিলে তাহা কখনও বোধগম্য হইত না।

বিষয়টি এইভাবে পরীক্ষা করা যায়ঃ কোন একটি নবজাত শিশুকে এইভাবে প্রতিপালন করুন, যাহাতে সে মায়ের গর্ভ হইতে শিশুর জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারটি ঘুনাক্ষরেও জানিতে বা দেখিতে না পারে। অতঃপর তাহাকে শিশুর জন্মগ্রহণ পদ্ধতি বাদ দিয়া অন্যান্য যাবতীয় দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় যত ইচ্ছা শিক্ষা দিন। সে বি, এ; এম, এ পাশ করিয়া ফেলিলে এক দিন তাহাকে বলুন, মিয়া, তুমি কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ বলিতে পার কি? প্রথমে তোমার পিতা তোমার মাতার নিকট গমন করিয়াছিলেন। ফলে কয়েক ফোঁটা বীর্য তোমার মায়ের গর্ভাশয়ে পতিত হয়। যেখানে থাকা অবস্থায় উহা প্রথমে রক্ত অতঃপর জমাট রক্ত ও পরে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। অতঃপর মাংসপিণ্ডে অস্থি গঠিত হইয়া পূর্ণদেহে রূপান্তরিত হয়। এরপর উহাতে প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত উহা গর্ভাশয়ে রক্ত দ্বারা প্রতিপালিত হয়। নয় মাস পরে তুমি মায়ের লজ্জাস্থান দিয়া ধরাধামে আগমন করিয়াছ। অতঃপর গর্ভাশয়ের রক্ত দুধের আকৃতি ধারণ করিয়া মায়ের বক্ষে প্রবাহিত হইয়াছে এবং উহা পান করিয়া তুমি দুই বৎসর পর্যন্ত প্রতিপালিত হইয়াছ।

www.BANGLAKITAB.com

এইরূপ বলিলে এই জ্ঞানী ছেলেটি প্রাণপণে ইহার বিরোধিতা করিয়া বলিবে, "ইহা হইতে পারে না। এক ফোঁটা বীর্য হইতে এরূপ সুন্দর সুঠাম দেহ গঠিত হওয়া ও মায়ের অপ্রশস্ত লজ্জাস্থান দিয়া বাহির হইয়া আসা বিবেক বহির্ভূত কথা।"

বলুন, বিবেক বহির্ভূত হইলেই তাহা ভুল এই নীতি মানিয়া লইলে মায়ের উদর হইতে জন্মগ্রহণ করার ব্যাপারটিও ভুল হইয়া যায় নাকি? আসল কথা এই যে, আপনারা অভ্যাসবিরুদ্ধ ব্যাপারকেই বিবেকবিরুদ্ধ আখ্যা দিয়া বসেন। উপরোক্ত ছেলেটির ব্যাপারেও তাহাই হইয়াছে। সে যেহেতু শিশুর জন্মগ্রহণ ব্যাপারটি কখনও দেখে নাই ও শুনে নাই, এই কারণে সে উহাকে বিবেক বিরুদ্ধ আখ্যা দিয়াছে। আপনি এ ব্যাপারে অভ্যস্ত, তাই আপনি ইহাকে বিবেক বিরুদ্ধ বলেন না। অভ্যস্ত না হইলে আপনিও ছেলেটির ন্যায় বলিয়া বসিতেন। ইহা জানা কথা যে, বিবেক বিরুদ্ধ বিষয় বাস্তবে রূপায়িত হইতে পারে না। অথচ আপনি অনেক চাক্ষুষ ও বাস্তব বিষয়কেও বিবেক বিরুদ্ধ বলিয়া থাকেন। সুতরাং আসলে উহা বিবেক বিরুদ্ধ নহে।

অভ্যাস বিরুদ্ধ ও বিবেক বিরুদ্ধের পার্থক্য ঃ প্রকৃতপক্ষে অভ্যাস বিরুদ্ধ কাজকেই বিবেক বিরুদ্ধ আখ্যা দেওয়া হয়। কোন বিষয় যথার্থ হওয়ার পক্ষে অভ্যাস বিরুদ্ধ হওয়া ক্ষতিকর নহে। ইহা অবান্তর হওয়ারও প্রমাণ নহে। নতুবা পূর্বোক্ত ছেলেটি যে মাতার গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করা অস্বীকার করে, তাহাও নির্ভুল মানিয়া লইতে হইবে। এ ছাড়া অন্যান্য যে সমস্ত বিষয় আমরা কিছুদিন পূর্বেও অসম্ভব মনে করিতাম; কিন্তু এখন তাহা বাস্তব সত্যে পরিণত হইয়াছে, তাহাও ভুল বলিতে হইবে। (যেমন, রেলগাড়ীর ঘণ্টায় ৬০ মাইল অতিক্রম করা, পাঁচ মিনিটের মধ্যে লণ্ডন হইতে তারযোগে সংবাদ আসা ইত্যাদি।)

দুনিয়াতে আরও বহু বিষয় অভ্যাস বিরুদ্ধ দেখা যায়। আমি একটি চারি পা বিশিষ্ট মুরগীর বাচ্চা দেখিয়াছিলাম। (কিছুদিন পূর্বে দিল্লীর প্রদর্শনীতে দুইটি বালিকা আসিয়াছিল। তাহাদের যাবতীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই পৃথক পৃথক ছিল; কিন্তু দুইজনের কোমর একত্রে সংযোজিত ছিল। প্রস্রাবের পথও পৃথক পৃথক ছিল, কিন্তু দুইজনের এক পথেই প্রস্রাব বাহির হইত।) কাজেই অভ্যাস বিরুদ্ধ বিষয়ে এমন কোন নিয়ম নাই যাহার উপর ভিত্তি করিয়া কোন কোন বিষয় স্বীকার করিয়া লওয়া যায়। সুতরাং অভ্যাস বিরুদ্ধ হইলেই তাহা অস্বীকার করা যায় না। আপনার নাস্তি হইতে অস্তিত্বে আসাও একটি অভ্যাস বিরুদ্ধ বিষয়। কেননা, অভ্যাসের চাহিদা হইল প্রত্যেক বিষয় স্ব স্ব অবস্থায় থাকা। যাহা অস্তিত্বহীন তাহা অস্তিত্বহীন থাকা এবং যাহা বিদ্যমান তাহা লয় প্রাপ্ত না হওয়া। কিন্তু আমরা দিবারাত্র এই চাহিদার বিরুদ্ধে কাজ হইতে দেখিতেছি। হাজার হাজার অস্তিত্বহীন বস্তু অস্তিত্বপ্রাপ্ত হইতেছে এবং লক্ষ লক্ষ বিদ্যমান বস্তু লয় প্রাপ্ত হইতেছে। সুতরাং কোন বিষয় অভ্যাস বিরুদ্ধ হইলেই তাহা অস্বীকার্য হইয়া যায় না।

আপনি অভ্যাস বিরুদ্ধ ও বিবেক বিরুদ্ধের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলিয়া মনে করেন না। ইহা নিতান্তই ভুল। শুনুন, আমি এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করিতেছি। যে সমস্ত বিষয় বিবেকের দৃষ্টিতে সম্ভবপর কিন্তু আমাদের চোখের সম্মুখে তাহা ঘটে না বলিয়া কঠিন ও অবিশ্বাস্য মনে হয়, তাহা অভ্যাস বিরুদ্ধ। পক্ষান্তরে যাহা বিবেকের দৃষ্টিতেই সম্ভবপর নহে এবং উহার অসম্ভবপরতা সম্বন্ধে বিবেকের কাছে সুনির্দিষ্ট যুক্তি আছে, উহাকে বিবেক বিরুদ্ধ বলা হয়।

সুতরাং যাহারা আখেরাতের বিষয় তথা পুলসিরাত, আমল ওযন করা ইত্যাদিকে বিবেক বিরুদ্ধ মনে করে, তাহারা উহাদের অসম্ভব হওয়ার পক্ষে সুনির্দিষ্ট যুক্তি উপস্থিত করুক। ইহা নিশ্চিত

www.BANGLAKITAB.com

কথা যে, তাহারা এরূপ কোন যুক্তি উপস্থাপিত করিতে পারিবে না। বেশীর বেশী ইহাই বলিবে, এগুলি কিরূপে হইবে তাহা আমাদের বোধগম্য নহে, ইহাদের কোন নযীর দেখাও ইত্যাদি। বস্, আজকালকার লোকদের যাবতীয় সন্দেহের সার হইল এই যে, কোন নযীর পাওয়া যায় না; কাজেই বিষয়টি অসম্ভব। অদ্ভুত যবরদস্তির যুগ বটে! সত্য বলিতে কি, কোন বিষয় প্রমাণিত হওয়ার তাৎপর্যই তাহাদের জানা নাই। নতুবা নযীর পাওয়া যাওয়ার উপর প্রমাণিত হওয়া নির্ভরশীল মনে করিত না। (আমি বলি, যে সকল আশ্চর্যজনক বস্তু আজকাল আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিছুদিন পূর্বে ইহাদের কোন নযীর কাহারও নিকট ছিল কি? যদি বলেন, ছিল না, তবে তখন উহা বিবেক বিরুদ্ধ ও অসম্ভব ছিল। এমতাবস্থায় পরে তাহা বাস্তবরূপ লাভ করিল কিরূপে? অতএব, নযীর পাওয়া যাওয়ার উপর কোনকিছুর প্রমাণ নির্ভরশীল নহে।) নযীর পেশ করার উদ্দেশ্য একমাত্র ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নহে। যে ব্যক্তি বাস্তবতার দাবী করে, নযীর পেশ করা তাহার পক্ষে মোটেই জরুরী নহে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি এই বলিয়া দাবী করে যে, ইহা অভ্যাস বিরুদ্ধ মো'জেযা হিসাবে ঘটিয়াছে কিংবা কিয়ামতের দিন এইরূপ অভ্যাস বিরুদ্ধ কাজ হইবে, তাহার পক্ষে নযীর পেশ করা কোন মতেই জরুরী হইতে পারে না। (কেহ অভ্যাস সম্মত বিষয়ের দাবী করিলে তাহার পক্ষে নযীর পেশ করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা যায়। আর যাহা অভ্যাসগত নহে বলিয়া দাবী করা হয়, তাহার নযীর চাওয়া বিস্ময়কর বটে।)

বাস্তবতার স্বরূপঃ এক্ষণে আমি বাস্তবতার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছি। ইহা জানা না থাকার ফলেই আজকালের মানুষের রুচি বিগড়াইয়া গিয়াছে। ফলে আজকাল আলেমদিগকে মে'রাজ ও চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার নযীর পেশ করিতে বলা হয়। কোন সংবাদের সত্যতা বা কোনকিছু ঘটা যে নযীরের উপর নির্ভরশীল নহে, তাহা সর্ববাদী সম্মত বিষয়। যুক্তির সহিত যাহাদের সামান্যও পরিচয় আছে, তাহারা ইহা ভালভাবেই জানে। দাবীকারী নযীর বর্ণনা করিয়া দিলে উহা তাহার অনুগ্রহ। হাঁ, সংবাদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুইটি বিষয় জরুরী। প্রথমতঃ, সংবাদটি সম্ভবপর হওয়া। দ্বিতীয়তঃ, সংবাদদাতা সত্যবাদী হওয়া। যাবতীয় মো'জেযা ও আখেরাতের বিষয়াদির বেলায় উপরোক্ত দুইটি বিষয়ের যথার্থতা প্রমাণ করিয়া দিলেই আমাদের দায়িত্ব পালন হইয়া যাইবে। এরপর এইসব বিষয় অস্বীকার করার অধিকার কাহারও থাকিবে না।

এখন আমরা মে'রাজ, পুলসিরাত, আমল ওযন করা ইত্যাদি বিষয়ের দলীল উপস্থিত করিতেছি। এ সম্বন্ধে প্রথম কথা এই যে, এগুলি বাস্তবপক্ষে সম্ভবপর। কাহারও এ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে সে অসম্ভব হওয়ার প্রমাণ উপস্থিত করুক। সম্ভবপরতা প্রমাণ করা আমাদের জন্য জরুরী নহে। কারণ, সম্ভবপর হওয়ার জন্য কোন কারণের প্রয়োজন নাই; বরং অসম্ভব হওয়ার দলীল না থাকাই সম্ভবপর হওয়ার দলীল।

দ্বিতীয় কথা এই যে, যে সংবাদের সংবাদদাতা সত্যবাদী, উহার বাস্তবতায় সন্দেহ করা যায় না। (উপরোক্ত বিষয়সমূহের সংবাদ একজন সত্যবাদী ব্যক্তি দিয়াছেন।) কাজেই এইগুলি বাস্তব ও প্রমাণিত। আমাদের এই দুইটি কথায় কেহ আপত্তি উথাপন করিলে উহার জওয়াব দেওয়া আমাদের কর্তব্য; কিন্তু ইহাদের নযীর পেশ করার দায়িত্ব আমাদের নহে।

উদাহরণতঃ, যদি কেহ বলে, পুলসিরাতের উপর দিয়া চলা বিবেক বিরুদ্ধ ব্যাপার। আমি ইহার উত্তরে বলিব, কেন, বিবেক বিরুদ্ধ ইহার কারণ দর্শাও। ইহা অসম্ভব হইল কিরূপে? কোন সূক্ষ্ম বস্তুর উপর পা রাখা অসম্ভব নহে। তদুপরি একজন সত্যবাদী ব্যক্তি ইহার সংবাদ দিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

এমতাবস্থায় ইহা অস্বীকার করার কারণ কি? কেহ প্রমাণসহ অস্বীকার করিলে কিংবা সত্যবাদী ব্যক্তির সংবাদ নহে বলিয়া প্রমাণ করিলে আমরা তাহার প্রমাণ শুনিতে প্রস্তুত আছি। এই দুইটি বিষয় প্রমাণিত হইয়া গেলে পর নযীর পেশ করা আমাদের দায়িত্ব নহে। নযীর জানা থাকিলেও আমরা তাহা বর্ণনা করিব না। আপনাকে সব বিষয় বলিয়া দেওয়া আমাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নহে।

পুলসিরাতের স্বরূপঃ প্রথমে পুলসিরাতের স্বরূপ বুঝা দরকার। কিন্তু আগেই বলিয়া দিতেছি যে, এ সম্পর্কিত বর্ণনা অকাট্য নহে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী পুলসিরাতের স্বরূপ অবগত হওয়া জরুরী নহে; বরং কার্যতঃ এ সম্পর্কে পাকাপোক্ত বিশ্বাস পোষণ করাই আসল কর্তব্য। তবে অনেকের মনের দুর্বলতা দূরীকরণার্থে আমি এই আলোচনার অবতারণা করিতেছি। তাহারা এইভাবেও পুলসিরাতের স্বরূপ বুঝিতে পারিলে তাহাতে ক্ষতির কিছু নাই।

পুলসিরাতের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করার পূর্বে চারিটি প্রাথমিক নীতি জানিয়া লওয়া দরকারঃ (১) আমাদের এই জড়জগৎ ছাড়া আরও একটি জগৎ আছে। (২) জগৎ পরিবর্তন হওয়ার ফলে কতক অবস্থারও পরিবর্তন ঘটে। যেমন, এই পৃথিবীর মধ্যেই আঞ্চলিক ব্যবধানের কারণে বিভিন্ন অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। (উদাহরণতঃ এখন এক অঞ্চলে রাত্রি কিন্তু অন্য অঞ্চলে দিন। আমাদের দেশে এখন গ্রীষ্মকাল, কিন্তু কোন কোন দেশে এখন শীতকাল। আমাদের এখানে ২৪ ঘণ্টায় একদিন হয়; কিন্তু কোন কোন এলাকায় ছয় মাসে দিন ও ছয় মাসে রাত্রি হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, কোরআনে বর্ণিত এক হাজার বৎসরের সমান একদিনের কথা শুনিয়া যাহারা উপহাস করে, তাহারা নির্বোধ বৈ কিছুই নহে। ইহা মোটেই অবিশ্বাস্য নহে। জড়জগতেই যখন বিভিন্ন অঞ্চলের দিবারাত্রির পরিমাণ বিভিন্ন হইতে দেখা যায় যে, কোন স্থানে ৬ মাসেও ১ দিন হয়, তখন জগৎ পরিবর্তন হওয়ার পর পরকালে এক হাজার বৎসরের সমান একদিন হইলে তাহাতে আশ্চর্যের কি থাকিতে পারে? (৩) পরিবর্তনের কোন নির্দিষ্ট সীমা নাই। ইহা আয়ত্তেও নহে। (৪) জড়জগতে যাহা বস্তু নহে, আখেরাতে তাহা বস্তুতে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব। যেমন আজকাল বিশেষ যন্ত্রাদি দ্বারা উত্তাপ, শৈত্য ইত্যাদি ওযন করা হয়। অথচ পূর্ববর্তী বৈজ্ঞানিকগণ এগুলিকে এমন অবস্তু বলিয়া জানিতেন, যাহার কোন ওযন বা পরিমাণ হইতে পারে না। কিন্তু বর্তমানে এগুলিও ওযনশীল বস্তু বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে।

এই কারণেই আমি বলি যে, যতই নূতন নূতন জিনিস আবিষ্কৃত হইতেছে, ততই আখেরাতের বিষয়াদি বুঝা সহজ হইতেছে। কিয়ামতের দিন হাত-পা খোদার কাছে সাক্ষ্য দিবে—ইহার বড় দলীল হইতেছে, বর্তমান যুগের গ্রামোফোন। গ্রামোফোনের আত্মা নাই, তা সত্ত্বেও ইহা কথা বলিতে পারে। সুতরাং মানবীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আত্মার মিশ্রণ আছে—উহা কথা বলিলে আশ্চর্য কি?

নাসায়ী শরীফের একটি হাদীসে বর্ণিত আছে—রাসূলে খোদা (দঃ) একদা সূর্যগ্রহণের নামাযান্তে বলিলেনঃ "আমি মসজিদের প্রাচীরের নিকট বেহেশত ও দোযখ দেখিতে পাইয়াছি।" ইহা শুনিয়া কেহ কেহ হাসিতে শুরু করে যে, বেহেশত ও দোযখ যমীন ও আসমান অপেক্ষা অনেক বড় বলা হয়। এমতাবস্থায় তিনি মসজিদের প্রাচীরে ইহাদিগকে কিরূপে দেখিলেন? খোদা তা'আলা ফটো ও দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করাইয়া এই প্রশ্নের সমাধান করিয়া দিয়াছেন। ফটোর মধ্যে বৃহত্তম জিনিসও ক্ষুদ্রতম আকারে দেখানো যায় এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ক্ষুদ্রতম

www.BANGLAKITAB.com

বস্তুও পাহাড়ের ন্যায় বিরাট আকৃতিতে দেখানো সম্ভব। সুতরাং খোদা আপন কুদরতের বলে জান্নাত ও দোযখের ফটো মসজিদের দেওয়ালে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন এবং হযরত (দঃ)-এর দৃষ্টিতে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের শক্তি পয়দা করিয়া দিয়াছেন—যাহাতে তিনি ছোট ফটো-গুলিকে উহাদের আসল আকৃতিতে দেখিতে পান। হাদীসে ব্যবহৃত শব্দও এদিকে ইঙ্গিত করে। হযরত (দঃ) এরূপ বলেন নাই যে, জান্নাত ও দোযখ পৃথিবীতে চলিয়া আসিয়াছিল; বরং তিনি বলিয়াছিলেনঃ مُثِّلَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ অর্থাৎ, "জান্নাত ও দোযখের প্রতিকৃতি আমাকে দেখানো হইয়াছে।"

উপরোক্ত কারণেই নূতন কিছু আবিষ্কৃত হইলে আমি আনন্দিত হই। কেননা, ইহাতে শরীঅতের ব্যাপারে দুর্বোধ্য ধারণার নিরসন হয়। উত্তাপ ও শৈত্য পরিমাপ করা এ যুগের একটি আশ্চর্য আবিষ্কার বটে! এই ঘরে কত ডিগ্রী উত্তাপ আছে এবং কত ডিগ্রী শৈত্য আছে, যন্ত্রের সাহায্যে তাহা জানা যায়। (থার্মোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে জ্বরাক্রান্ত রোগীর শরীরের উত্তাপ পরিমাপ করা হয়।) উত্তাপ ওযন করার কথা কোন অশিক্ষিত ব্যক্তিকে জানাইলে সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যাইবে যে, উত্তাপও কি ওযন হইতে পারে! বস্তু নহে—এমন জিনিসের পরিমাপ যখন দুনিয়াতেই শুরু হইয়াছে, তখন আখেরাতে এগুলিই বস্তুতে রূপান্তরিত হইয়া গেলে তাহাতে আশ্চর্যের কি আছে?

একটি গ্লাসে ঠাণ্ডা পানি লইয়া ওযন করিলে যে পরিমাণ হইবে, গরম পানি লইয়া ওযন করিলে সেই পরিমাণ হইবে না। অথচ গ্লাসে পানির উচ্চতা উভয় অবস্থায়ই সমান ছিল। এমতাবস্থায় ওযনের এই তারতম্য কেন? ইহাতে বুঝা যায় যে, উত্তাপ ও শৈত্যের নিজস্ব ওযন আছে—যদিও তাহা পানির সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ধরা যায়। সুতরাং ইহকালে যাহা বস্তু নহে, উহা আখেরাতে বস্তুতে পরিণত হইয়া যাওয়া আশ্চর্যজনক নহে।

চিকিৎসকদের মতে পিত্ত প্রধান ব্যক্তি প্রায়ই স্বপ্নে অগ্নি দেখিতে পায়। এখানে পিত্তের উত্তাপ যাহা বস্তু নহে—স্বপ্নলোকে অগ্নি তথা বস্তুতে পরিণত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আখেরাতেও এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে।

উপরোক্ত চারিটি ভূমিকার পর এখন পুলসিরাতের স্বরূপ বুঝুন। অবশ্য ইহা বর্ণনার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি এরূপ থাকা চাইঃ

حديث مطرب و مے گو و راز دهر كمتر جو

كه كس نكشود و نكشايد بحكمت ايں معما را

(হাদীসে মুতরিব ও মায় গো ও রাযে দহর কমতর জো
কেহ্ কস্ নাকাশুদ ও নাকুশায়াদ বহেকমত ইঁ মোআম্মা রা)

অর্থাৎ, 'খোদাপ্রেমিক ও প্রেমের কথা বল। সৃষ্টি-রহস্যের পিছনে পড়িও না। কেননা, কেহ জ্ঞান দ্বারা এই ধাঁধাঁর সমাধান করিতে পারে নাই এবং পারিবেও না।'

পূর্বেই বলিয়াছি, ইহা বর্ণনা করা আমার দায়িত্ব নহে। তবে তৃপ্তি লাভের নিমিত্ত অনুগ্রহস্বরূপ বলিয়া দিতেছি। পুলসিরাতের স্বরূপ হইল শরীঅত। ইহাই দুনিয়াতে পুলসিরাতের নযীর। পার্থক্য এই যে, এখানে ইহা অবস্তুবাচক বিষয় এবং আখেরাতে ইহাই বস্তুর রূপ ধারণ করিবে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ইহা পুলসিরাতের পূর্ণাঙ্গ নযীর।

www.BANGLAKITAB.com

শরীঅতের পথঃ পুলসিরাত যেমন চুল হইতেও সূক্ষ্ম এবং তলোয়ার হইতেও ধারাল হইবে, তদ্রূপ শরীঅতের পথও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সঙ্কটপূর্ণ। ইহার উপর দৃঢ়তা বজায় রাখিয়া চলা সকলের পক্ষে সহজ নহে। কারণ, এলম ও আমল এই দুইটি বিষয় লইয়া শরীঅত গঠিত। সুতরাং এই পথে চলিতে হইলে প্রথমে দুইটি শক্তির প্রয়োজন। (১) জ্ঞানশক্তি ও (২) কর্মশক্তি। জ্ঞানশক্তির সম্পর্ক বিবেকের সহিত এবং কর্মশক্তির সম্পর্ক ইচ্ছার সহিত। কর্ম কতক উপকারী ও কতক অপকারী। সুতরাং ইহাতে কখনও উপকার লাভ করা এবং কখনও অপকার দূর করার প্রয়োজন হয়। যে ইচ্ছা উপকার লাভের সহিত সংশ্লিষ্ট, উহাকে কামনাশক্তি বলা হয় এবং যে ইচ্ছা অপকার দূর করার সহিত সম্পর্কযুক্ত, উহাকে ক্রোধশক্তি বলা হয়। অতএব, শরীঅতের উপর পূর্ণরূপে আমল করিতে হইলে মোটামুটি তিনটি শক্তির প্রয়োজন। (১) জ্ঞানশক্তি, (২) কামনাশক্তি ও (৩) ক্রোধশক্তি।

এইগুলিকেই চরিত্রের মূলনীতি আখ্যা দেওয়া হয়। ইহাদের প্রত্যেকটির তিনটি করিয়া স্তর আছে। (১) বাহুল্য, (২) স্বল্পতা ও (৩) মধ্যবর্তিতা। তন্মধ্যে মধ্যবর্তিতাই হইতেছে শরীঅত। শরীঅতে জ্ঞান বা বিবেকের বাহুল্য ও স্বল্পতার স্থান নাই; বরং ইহাতে মধ্যবর্তিতা সর্বতোভাবে প্রয়োজন। ইহাই হেকমত বা জ্ঞান। বিবেকের বাহুল্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়। বিবেক প্রাধান্য লাভ করিলে সবকিছুতেই সন্দেহ দেখা দেয়। ফলে মানুষ সন্দেহপরায়ণ হইয়া পড়ে।

দার্শনিকদের মধ্যে 'লা আদরিয়া' নামে এক সম্প্রদায় আছে। তাহারা কোন সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তাহারা বলে, "অনেক সময় আমরা দূর হইতে কোন আকৃতি দেখিয়া উহাকে মানুষ মনে করি, কিন্তু নিকটে গেলে দেখা যায়, উহা মানুষ নহে, গাধা। একজনকে অনেকে সুশ্রী মনে করে, আবার অনেকেই তাহাকে কুশ্রী বলিয়া জানে। এক বস্তুকে কেহ মিষ্ট আখ্যা দেয়, আবার জ্বরাক্রান্ত রোগী উহাকেই তিক্ত বলে। তদ্রূপ কোন যুক্তিকে একদল বিশুদ্ধ বলিলে অন্যদল উহাকে ভুল আখ্যা দেয়। সুতরাং আমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এত তফাৎ ও ভুলভ্রান্তি থাকা অবস্থায় ইহার উপর কিরূপে ভরসা করা যায়? আমাদের ইন্দ্রিয় যে বস্তুকে মানুষ বলিবে, উহা যে মানুষই হইবে, গাধা হইবে না, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। আমরা যাহাকে জমিন বলি, উহা জমিনই হইবে আসমান হইবে না, তাহাও জোর গলায় দাবী করা যায় না। কারণ, আমাদের দৃষ্টি ভুল করিতে পারে।" এইরূপ মতবাদের ফলে তাহারা প্রত্যেক বিষয়েই সন্দেহ পোষণ করে। বলিতে কি, সন্দেহের ব্যাপারেও তাহারা সন্দেহ করে।

فَهُوَ شَاكٌّ وَشَاكٌّ فِيْ اَنَّهٗ شَاكٌّ

বিবেকের সীমাঃ বন্ধুগণ! বিবেক সীমাতিরিক্ত বাড়িয়া গেলে অশেষ পেরেশানী পোহাইতে হয়। জীবনকেও ধ্বংস করিয়া দেয়। বড় বড় দার্শনিকদের ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার ইহাই কারণ। তাহারা বিবেকের আওতা বহির্ভূত বিষয়েও বিবেককে কাজে লাগাইয়াছে। সীমা ছাড়াইয়া গেলে প্রত্যেক বিষয়ই ক্ষতিকর হইয়া দাঁড়ায়।

আমি প্রায়ই বিবেকের একটি উদাহরণ দিয়া থাকি। আমাদের পক্ষে বিবেক পর্বতারোহীর পক্ষে ঘোড়ার ন্যায়। কেহ ঘোড়ায় সওয়ার হইয়া পর্বতের নিকট পৌঁছার পর যদি ঘোড়ায় চড়িয়াই পর্বতের উপরিভাগে যাইতে চায়, তবে তাহা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার কাজ হইবে। কারণ, এই ব্যক্তি কোন খাড়া ঢালু পথে পৌঁছামাত্রই ঘোড়াসহ সজোরে নীচে পতিত হইবে। অপর পক্ষে যদি কেহ পর্বতে ঘোড়া দ্বারা কোন কাজ চলিবে না ভাবিয়া সমতল সড়কেও উহা ব্যবহার না করে এবং

www.BANGLAKITAB.com

পায়ে হাঁটিয়াই বাড়ী হইতে রওয়ানা হইয়া যায়, তবে সে-ও পর্বত পর্যন্ত পৌঁছিতে পৌঁছিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িবে এবং শেষ পর্যন্ত সে পর্বতারোহণে সমর্থ হইবে না। সুতরাং উল্লিখিত দুই ব্যক্তিই ভ্রান্ত। প্রথম ব্যক্তি ঘোড়াকে এত কার্যক্ষম মনে করে যে, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত উহাকে কাজে লাগাইতে চায়। দ্বিতীয় ব্যক্তি উহাকে একেবারে বেকার ভাবিয়া পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছিতেও উহার সাহায্য লয় না। এখানে নির্ভুল কথা হইল এই যে, পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছিতে ঘোড়া কার্যক্ষম, কিন্তু পাহাড়ে আরোহণের পক্ষে সম্পূর্ণ বেকার। উহার জন্য অন্য কোন যানবাহনের প্রয়োজন।

বিবেকের অবস্থাও তদ্রূপ। ইহাকে কোন কাজে না লাগানো নির্বুদ্ধিতা, তেমনি ইহাকে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগানোও ভুল। শুধু তওহীদ ও রেসালাতকে বুঝার বেলায় বিবেককে কাজে লাগান। খোদার কালাম যে খোদারই কালাম তাহাও বিবেক দ্বারা বুঝান। এর পর ধর্মের শাখা-প্রশাখায় বিবেক খাটানো উচিত নহে। সেক্ষেত্রে খোদা ও রাসূলের নির্দেশের সম্মুখে মাথা নত করিয়া দেওয়া কর্তব্য—অন্তর্নিহিত রহস্য বুঝুন বা না বুঝুন।

রাষ্ট্রীয় আইন স্বীকৃত করানোর বেলায় প্রথমে এইরূপ বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, উদাহরণতঃ ইনি বাদশাহ্ পঞ্চম জর্জ। অতঃপর যাবতীয় আইন-কানূন সম্বন্ধে বলিয়া দেওয়া হয় যে, এইসব বাদশাহ্রই আইন-কানূন; কাজেই মানিতে হইবে। এই উপায়ে আইন স্বীকৃত করানো সহজ। জ্ঞানিগণ এই উপায়ই অবলম্বন করেন। কিন্তু কেহ পঞ্চম জর্জকে বাদশাহ্ স্বীকার করিয়া তাহার প্রত্যেক আইন-কানূনে বিতর্ক উত্থাপন করিয়া উহা মানিতে অস্বীকার করিলে সে সর্বত্র লাঞ্ছিত হইবে নাকি? এক্ষেত্রে জ্ঞানিগণ ইহাই বলিবেন যে, বাদশাহ্কে বাদশাহ্ বলিয়া এবং তাঁহার আইনকে রাষ্ট্রীয় আইন জানার পর উহা স্বীকার না করার কোন কারণ নাই; বরং ইহাকে স্বীকৃতি দিতেই হইবে—বুঝে আসুক বা না আসুক।

অতএব, রাষ্ট্রপতিকে চিনিবার বেলায় বিবেক দ্বারা কাজ লওয়ার অনুমতি আছে, কিন্তু এর পর বিবেক খাটানোর অনুমতি নাই। কাজেই ধর্মীয় ব্যাপারে আপনি শেষ পর্যন্ত বিবেক খাটাইতে চান কোন্ যুক্তিতে? ইহা নিতান্তই ভুল। লাঞ্ছনা ভোগ করা ছাড়া ইহাতে কোন লাভ নাই। খোদাকে স্বীকার করিলে তাঁহার রাসূলকেও রাসূল বলিয়া এবং তাঁহার কালামকেও কালাম বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এর পর খুঁটিনাটি নির্দেশসমূহে বিতর্ক উত্থাপন করার কোন অধিকার আপনার নাই। এরূপ করিলে সকলেই আপনাকে বোকা মনে করিবে এবং জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে আপনি হেয় প্রতিপন্ন হইবেন। সত্য এই যেঃ

عزیزیکه از درگهش سر بتافت ـ بهر در که شد هیچ عزت نیافت

(আযীযে কেহ্ আয দরগাহশ সর বতাফ্ত + বহর দর কেহ্ শোদ হীচ ইয্যত না ইয়াফ্ত)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্র দরবার হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছে, সে যে কোন দরবারেই যাক না কেন, কোন ইয্যতই পাইবে না।"

মোটকথা, যে পর্যন্ত বিবেক কাজ দিতে পারে, ঐ পর্যন্ত উহা দ্বারা কাজ নিন। যেখানে উহা কার্যক্ষম নহে, সেখানে পরিত্যাগ করুন এবং নির্দেশের অনুসরণ করুন। বিবেকেরও একটি সীমা আছে। কারণ ইহা একটি শক্তি মাত্র। যেমন দৃষ্টি একটি শক্তি। ইহার জন্য সীমা নির্দিষ্ট আছে। সীমার বাহিরে সে দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখিতে পায় না। শরীঅতের ব্যাপারে বিবেকও তদ্রূপ। শুধু মূলনীতি পর্যন্ত কাজে আসে এরপর শাখা-প্রশাখায় একা ইহা দ্বারা কাজ হয় না। সেখানে

www.BANGLAKITAB.com

ওহীর দূরবীনের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। আমাদের কানও একটি শক্তি। ইহা নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে আওয়ায ধরিতে পারে। সীমার বাহিরে হইলে টেলিফোনের আশ্রয় লইতে হয়। পদযুগলের কার্যক্ষমতারও একটি সীমা আছে। সীমাতিরিক্ত কাজ নিতে হইলে যানবাহন ছাড়া চলে না। অতএব, সকল শক্তিই সীমাবদ্ধ। কাজেই বিবেক শক্তিও সীমাবদ্ধ না হইয়া পারে না। সীমার বাহিরে ওহীর সাহায্য নিতে হয়, অন্যথায় স্মরণ রাখিও যে, আজীবন রাস্তা পাইবে না। ওহীর নির্দেশের ব্যাপারে বিবেক কোন কাজে আসে না। সেখানে রাসূলের অনুসরণ ব্যতীত গতি নাই।

কবি বলেনঃ

خلاف پیمبر کسے رہ گزید ـ کہ ہرگز بمنزل نخواهد رسید

(খেলাফে পয়াম্বর কাসে রাহ্ গুযীদ + কেহ্ হরগিয বমন্‌যিল নাখাহাদ রসীদ)

"যে কেহ রাসূলুল্লাহ্ (দঃ)-এর সুন্নাতের বিপরীত রাস্তা অন্বেষণ করিবে, সে কিছুতেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিবে না।"

তক্‌লীদের আবশ্যকতাঃ বন্ধুগণ, দুনিয়াতেও আপনারা অনেক ক্ষেত্রে বিবেককে পরিত্যাগ করত একজন না একজনের অনুসরণ করেন। আপনি যখন অসুস্থ হন, তখন কোন্ চিকিৎসক পারদর্শী ও অভিজ্ঞ এবং কে অপারদর্শী ও অনভিজ্ঞ, বিবেক দ্বারা শুধু তাহাই জানিয়া লন। কোন চিকিৎসক অভিজ্ঞ বলিয়া পছন্দ হইয়া গেলে আপনি তাহার নিকট যান। সে নাড়ী দেখিয়া ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দেয়। তখন আপনি কি তাহাকে এইরূপ বলেন যে, এই ঔষধটি কেন লিখিলেন, অমুকটি লিখিলেন না কেন? কিংবা এই ঔষধটি মাত্র চার মাষা লিখিলেন কেন, ছয় মাষা লিখিলেন না কেন? কোন রোগী ডাক্তারের সহিত এইরূপ তর্ক করিয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। কেহ করিলে বুদ্ধিমান মাত্রই তাহাকে বোকা আখ্যা দিবে। চিকিৎসকও পরিষ্কার বলিয়া দিবে, "মিয়া, যদি আমাকে চিকিৎসক মনে করিয়া এখানে আসিয়া থাক, তবে আমার ব্যবস্থাপত্রে কোনরূপ প্রশ্ন করার অধিকার তোমার নাই। করিলে ইহার অর্থ হইবে যে, তুমি আমাকে চিকিৎসক মনে কর না, তবে আমার কাছে কেন আসিয়াছ?" চিকিৎসকের এই উত্তর জ্ঞানী মাত্রই সঠিক মনে করিবে।

অতএব, রাসূলকে রাসূল এবং কোরআনকে খোদার কালাম মানিয়া লওয়ার পরে 'বিবেকসম্মত নহে' এই দোহাই দিয়া কথায় তর্কের অবতারণা করা এবং বিবেককে উহার অনুগত করা আশ্চর্যের বিষয় নয় কি? বন্ধুগণ, রাসূলকে রাসূল মানিয়া লওয়ার পর তাঁহার প্রত্যেক কথাই বিনা দ্বিধায় মানিয়া লইতে হইবে। একথা বলিবার অধিকার নাই যে, ইহা বিবেকসঙ্গত নহে। অন্যথায় অর্থ এই হইবে যে, আপনি রাসূলকে রাসূল এবং কোরআনকে খোদার কালাম মনে করেন না। পরিতাপের বিষয়, সাংসারিক ব্যাপারে আপনি বিবেকের সীমা স্বীকার করেন এবং চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্রে বিবেক খাটানো অন্যায় মনে করেন; কিন্তু আখেরাতের বিষয়সমূহে বিবেকের সীমা স্বীকার করিতে চান না।

সাহেবান! নির্দিষ্ট সীমার পর বিবেককে ত্যাগকরত অন্যের অনুসরণ ব্যতীত যদি দুনিয়ার কাজকারবার চলিতে না পারে, তবে আখেরাতের কাজ চলিবে কিরূপে? দুনিয়ার কাজকারবার চোখে দেখা যায়। ইহাতে বিবেককে কিছু না কিছু কাজে লাগানো যাইতে পারে। তা সত্ত্বেও

www.BANGLAKITAB.com

ইহাকে ত্যাগ করিয়া পারদর্শী ও বিশেষজ্ঞদের অনুসরণ করা হয়। অপরপক্ষে আখেরাতের বিষয়াদি লোক-চক্ষুর অন্তরালে। সুতরাং সে ক্ষেত্রে ওহীর অনুসরণ না করিয়া উপায় আছে কি? এক্ষেত্রে বিবেক খাটাইলে তাহা "অন্ধের বক্র খীরের" ন্যায় হইবে।

ঘটনা এইরূপঃ একটি ছেলে জনৈক অন্ধ হাফেয সাহেবকে খীরের দাওয়াত করিতে আসিল। হাফেয সাহেব ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খীর কেমন জিনিস?" ছেলে বলিল, "সাদা"। অন্ধের নিকট সাদা কালো সবই সমান। তাই তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, "সাদা কেমন?" উত্তর হইল, "বকের ন্যায়"। হাফেয সাহেব বলিলেন, "বক কেমন"? ছেলেটি আপন হাত বকের ঘাড়ের মত বক্র করিয়া বলিল, "এমন"। হাফেয সাহেব হাত বাড়াইয়া ছেলেটির হাতে হাত বুলাইয়া আকৃতিটি বুঝিয়া ফেলিলেন। অতঃপর বলিলেন, 'আরে ভাই' খীর তো বড্ড বক্র জিনিস দেখা যাইতেছে, ইহা তো আমার গলায় আটকাইয়া যাইবে।

দেখুন, চোখে যাহা দেখা যায় না, তাহাতে বিবেক খাটাইলে এইরূপ পরিণতি দাঁড়ায়, যে খীর চিবাইতে ও গিলিতে মোটেই কষ্ট হয় না, তাহা এখন গলায় আটকাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাস্তবিকই অন্ধকে কেহ সাদা রং বুঝাইতে পারিবে না। হাফেয সাহেব সারা জীবন চেষ্টা করিলেও ইহা বুঝিতে পারিবেন না। এ ব্যাপারে কোন হিতাকাঙ্ক্ষী চক্ষুষ্মান ব্যক্তির অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

আপনি কোন বিলাতী লোককে আমের স্বাদ বুঝাইতে চাহিলে সে কিছুতেই বুঝিবে না। কারণ, সে কোন দিন আম খায় নাই। আপনি হয়তো বলিবেন, আম মিষ্ট। সে বলিবে, আমরা রোজই গুড় খাই। আম বোধ হয় গুড়ের মতই হইবে। বিলাতীকে বুঝাইবার একমাত্র পন্থা এই যে, তাহাকে একটি আম খাওয়াইয়া দিন। নতুবা তাহার উচিত আপনার কথা মানিয়া লওয়া এবং বিবেক খাটাইয়া উহার নযীর বাহির করার চেষ্টা না করা।

আখেরাতের বিষয়াদি পূর্ণরূপে বুঝিবার ইচ্ছা থাকিলে ইহার পন্থা এই যে, মৃত্যুর অপেক্ষা করুন। মৃত্যুর পর পুলসিরাত, আমল ওযন করা ইত্যাদি সবকিছুর স্বরূপ চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে। আর যদি দুনিয়াতে বুঝিতে চান, তবে কোরআন ও রাসূলের উক্তির অনুসরণ করুন এবং নযীর খোজাখুঁজির চেষ্টা হইতে বিরত থাকুন। নযীর দ্বারা আখেরাতের স্বরূপ বুঝার চেষ্টা হাফেয সাহেবের খীর বুঝার ন্যায় হইবে। এখন ভাল করিয়া বুঝিয়া লউন যে, বিবেকের একটি সীমা আছে, উহা অতিক্রম করা খুবই ক্ষতিকর।

বাহুল্য ও স্বল্পতার পরিণামঃ বাহুল্য ও স্বল্পতা ক্ষতিকর বলিয়া চিকিৎসকগণও মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাকে রোগ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কেননা, বিবেকের বাহুল্যের পরিণাম হইল অতিমাত্রায় সন্দেহপরায়ণ হইয়া উঠা। ইহার ফলে অন্তর ও মস্তিষ্ক উভয়ই দুর্বল হইয়া পড়ে।

জনৈক ব্যক্তি হালুয়া বিক্রয় করিত। দার্শনিক ফারাবী একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, كَيْفَ تَبِيْعُ الْحَلْوَاءَ "তুমি হালুয়া কিরূপে বিক্রয় কর?" সে উত্তর দিল, كَذَا بِدَانِقٍ "এক দানেকে (মুদ্রায়) এই পরিমাণ।" ইহাতে ফারাবী বলিলেন, اَسْئَلُكَ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ وَتُجِيْبُنِىْ عَنِ الْكَمِّيَّةِ "আমি বিক্রয়ের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আর তুমি পরিমাণ জানাইতেছ।" এই বলিয়া তিনি হালুয়া বিক্রেতার সহিত তর্কে প্রবৃত্ত হইয়া গেলেন।

ইহা হইল বিবেক বিসূচিকা যে, সর্বদাই ইহার পিছনে পড়িয়া থাকে, বিবেকের এই বাহুল্যের কারণেই দার্শনিকগণ পয়গম্বরদের সহিত মোকাবিলা করিয়াছেন। তাহারা শেষ পর্যন্ত পরাজয়

www.BANGLAKITAB.com

বরণ করিয়া নবুওত স্বীকার করিলেও সঙ্গেসঙ্গে বলিয়া দিয়াছেন যে, ইনি মূর্খদের নবী, আমাদের জন্য নহে। আমাদের জন্য নবীর প্রয়োজন নাই ঃ

نَحْنُ قَوْمٌ قَدْ هَذَّبَنَا نُفُوْسَنَا بِالْحِكْمَةِ *

"আমরা দর্শন দ্বারাই শিষ্টতা লাভ করিতে পারি।" ইহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ فَرِحُوْا بِمَا عِنْدَهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ "তাহারা আপন জ্ঞানগরিমায় গর্বিত হইয়া পড়িয়াছে।" নবুওতের এল্‌ম যে, বিবেকের বহু ঊর্ধ্বে, তাহারা তাহা বুঝে নাই। 'ইলাহিয়্যাৎ' (খোদা ও আত্মা সম্বন্ধীয় দর্শন)-এর বর্ণনায় তাহারা বহু ভুল তথ্য পরিবেশন করিয়াছে। আজকাল মুসলমানদের সাধারণ ছাত্রও উহা পাঠ করিয়া হাসি রোধ করিতে পারে না। ইহা হইল বিবেকের বাহুল্য সম্বন্ধে বর্ণনা। ইহার বিপরীতে আছে বিবেকের স্বল্পতা। উহাকে নির্বুদ্ধিতা বলা হয়। শরীঅতের দৃষ্টিতে এই উভয়টিই অকেজো ও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে মধ্য পন্থাই কাম্য—যাহাকে হেকমত বলা হয়।

শরীঅতের প্রাণ ঃ বিবেক শক্তির ন্যায় কামনা শক্তির মধ্যেও তিনটি স্তর আছে। ইহাতে বাহুল্যের স্তরকে ফুযূর (পাপাচার) বলা হয়। ইহা শরীঅতে কিছুতেই কাম্য নহে। কারণ, ইহার পরিণতি হইল ফিস্‌ক (অবাধ্যতা)। কামনা শক্তির দ্বিতীয় স্তরের স্বল্পতায় মানুষ প্রয়োজনীয় উপকার লাভ হইতেও অকেজো হইয়া যায়। সুতরাং ইহাও শরীঅতে কাম্য নহে। ইহাতে উৎসাহ-উদ্দীপনা হ্রাস পায় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা লোপ পায়। অপর স্তর হইতেছে মধ্যবর্তিতার স্তর। ইহাকে ইফ্‌ফত (সাধুতা) বলা হয়। ইহাই শরীঅতে কাম্য।

এইরূপে ক্রোধশক্তির মধ্যেও তিনটি স্তর আছে। একটি বাহুল্যের স্তর। ইহাকে 'তাছাওওর' বলা হয়। ইহার অর্থ স্থান, কাল, পাত্র না দেখিয়া শুধু জোশ দেখানো। যেমন, আজকাল মানুষের মধ্যে ইহার প্রাচুর্য দেখা যায়। যে কোন কাজে অন্ধের ন্যায় আমল করা হয়। লাভ বা ক্ষতির দিকে লক্ষ্য করা হয় না। এই স্তরটি শরীঅতের দৃষ্টিতে পছন্দনীয় নহে। ক্রোধশক্তির অপর স্তর হইল স্বল্পতার স্তর। ইহাকে ভীরুতা ও কাপুরুষতা বলা হয়। অর্থাৎ, প্রয়োজনের মুহূর্তেও সাহসিকতা প্রদর্শন না করা। উদাহরণতঃ কিছু সংখ্যক লোক ভীরুতা বশতঃ ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের সম্মুখে আদব-তাহ্‌যীবের সহিত আপন প্রয়োজনের কথাও ব্যক্ত করিতে পারে না। এই স্তরটিও শরীঅতে কাম্য নহে। তৃতীয়ত, মধ্যবর্তিতার স্তর, ইহাকে 'শাজাআত' (বীরত্ব) বলা হয়। ইহাই শরীঅতে কাম্য। ইহার অর্থ যেখানে জোশ দেখানো প্রয়োজন এবং অপকারের চেয়ে উপকার বেশী হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানেই জোশ দেখানো। অপর পক্ষে যেখানে জোশ দেখাইলে ক্ষতির আশঙ্কা প্রবল, সেখানে জোশ প্রদর্শন হইতে বিরত থাকা।

অতএব, উত্তম চরিত্রের মূলনীতি তিনটি। (১) হিকমত, (২) সাধুতা ও (৩) বীরত্ব। এই তিনটির সমষ্টির নাম আদল (মধ্যপন্থা) ইহাই শরীঅতের সারবস্তু। কোরআনে বলা হইয়াছে ঃ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا 'আমি তোমাদিগকে মধ্যবর্তী উম্মতরূপে পরিণত করিয়াছি।' এই আয়াতেও উপরোক্ত 'আদল' বুঝানো হইয়াছে। অর্থাৎ, আমি (আদি-অন্ত ন্যায়নীতিতে পূর্ণ একটি শরীঅত দান করিয়া) এই উম্মতকে মধ্যবর্তী উম্মতে অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ উম্মতে পরিণত করিয়াছি।

আরও একটি নীতি লক্ষ্য করুন ঃ মধ্যবর্তিতা দুই প্রকার। একটি যথার্থ ও অপরটি প্রচলিত। যথার্থ মধ্যবর্তিতা এমন একটি রেখা যাহা একেবারে মধ্যস্থল দিয়া অতিক্রম করিয়াছে। ইহা

www.BANGLAKITAB.com

বিভাজ্য নহে। প্রচলিত মধ্যবর্তিতা হইতেছে যেমন বলা হয় যে, এই স্তম্ভটি ঘরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখানে স্তম্ভটি যথার্থ মধ্যবর্তী নহে। কারণ, ইহাকে বিভক্তকরত ইহার মধ্য হইতেও মধ্যবর্তী বস্তু বাহির করা যাইতে পারে।

সুতরাং শরীঅত এমন একটি মধ্যবর্তী বিষয়—যাহাতে বাহুল্য, স্বল্পতা ইত্যাদি কোন অংশ বাহির করা যায় না। এই যথার্থ মধ্যবর্তিতাই শরীঅতের প্রাণ এবং ইহাই পূর্ণত্ব। শরীঅতের এই প্রাণ কোনরূপে বিভাজ্য নহে। এরূপ মধ্যবর্তী পথে প্রতিষ্ঠিত থাকা বাস্তবিকই সুকঠিন।

অতএব, বাহুল্য ও স্বল্পতা বর্জিত হওয়ার কারণে শরীঅত তলোয়ার হইতেও ধারাল এবং বিভাজ্য না হওয়ার কারণে চুল হইতেও সূক্ষ্ম। কারণ, চুলকেও কোন না কোনরূপে ভাগ করা যায়; কিন্তু শরীঅতের প্রাণ তথা যথার্থ মধ্যবর্তিতা কোনরূপেই বিভাজ্য নহে। কিয়ামত দিবসে এই যথার্থ মধ্যবর্তিতা বস্তুর রূপ ধারণ করিয়া পুলসিরাত হইয়া যাইবে। মুসলমানদিগকে ইহার উপর দিয়া চলিতে বলা হইবে। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সরলভাবে শরীঅতের উপর দ্রুততার সহিত চলিবে, সে আখেরাতেও পুলসিরাতের উপর দ্রুতগতিতে চলিতে পারিবে। কারণ, পুলসিরাত দুনিয়ার শরীঅতেরই ভিন্নরূপ। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে শরীঅতের উপর চলে নাই, কিংবা উদাসীনভাবে চলিয়াছে, সে আখেরাতেও পুলসিরাতের উপর চলিতে পারিবে না। কিংবা ধীর গতিতে চলিবে।

নিন, আমি পুলসিরাতেরও নযীর বর্ণনা করিয়া দিলাম। এখন বোধ হয় মনে কোনরূপ খটকা বাকী নাই। শুধু পুলসিরাত কেন শরীঅতের অন্যান্য বিষয়াদিরও আমাদের কাছে এমনি যুক্তিপূর্ণ নযীর আছে। তবে উহা বর্ণনা করা আমাদের আসল লক্ষ্য নহে। আমাদের আসল লক্ষ্য হইল ঃ

ماقصهٔ سکندر و دارا نخوانده ایم ــ از ما بجز حکایت مهر و وفا مپرس

(মা কিছ্ছায়ে সেকান্দর ও দারা না খান্দায়েম + আয মা বজুয হেকায়েতে মোহর ও ওফা মপুরস)

আমরা সেকান্দর ও দারার কাহিনী পড়ি নাই। খোদার অনুগ্রহ ও আনুগত্য কাহিনী ছাড়া আমাদের কাছে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করিও না।

তত্ত্ব ও রহস্যের মুখোস উন্মোচন ঃ নমুনা হিসাবে উপরোক্ত বর্ণনার অবতারণা করিয়াছি। ইহাতে বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক বিষয়েরই উক্তরূপ তত্ত্বাদি আমাদের জানা আছে। ইহাতে আরও বুঝিতে পারিবেন যে, শরীঅত সম্পর্কিত বিদ্যার সম্মুখে দর্শনের কোন মূল্য নাই। মুসলমান আলেমদের কাছে খোদার ফজলে উপরোক্তরূপ আলোচনার প্রচুর উপকরণ মওজুদ রহিয়াছে। তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে রিক্তহস্ত মনে করিবেন না, তবে ঃ

مصلحت نیست که از پرده بروں افتد راز

ورنه در مجلس رنداں خبرے نیست که نیست

(মাছলেহাত নীস্ত কেহ আয পরদা বেরুঁ উফতাদ রায
ওরনা দর মজলিসে রেন্দাঁ খবরে নীস্ত কেহ নীস্ত)

অর্থাৎ, গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আশেকদের নিকট কোন বিষয় অপরিজ্ঞাত নহে।

মাছলেহাত এজন্য নহে যে, প্রত্যেকেই তত্ত্বাদির আলোচনা শুনিবার যোগ্য নহে। আমরা যোগ্য ব্যক্তিদিগকেও বলি না। কারণ, এসব বিষয় বর্ণনা করা আমাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নহে।

www.BANGLAKITAB.com

(চিকিৎসকের দায়িত্ব শুধু ব্যবস্থাপত্র দেওয়া। ঔষধের গুণাগুণ ও পরিমাণের হেতু বর্ণনা করা তাঁহার কাজ নহে।) হাঁ, কোন যোগ্য ব্যক্তি আমাদের সংসর্গে থাকিলে এবং আমাদের নির্দেশানুযায়ী কাজ করিলে ভাবাবেগে পড়িয়া অনেক সময় এগুলি তাহাকে বলিয়া দেই। আবার জিজ্ঞাসা করিলেও কাহাকে বলি না। কেননা, এগুলি তত্ত্ব কথা। ভাবের আতিশয্যে আপনা-আপনিই মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্তি আসে। যেমন, চিকিৎসক মাঝে মাঝে আনন্দের আতিশয্যে আপন ব্যবস্থাপত্রের প্রশংসা ও স্বরূপ বর্ণনা করিয়া দেয়; কিন্তু রোগী জিজ্ঞাসা করিলে বিরক্তি বোধ করে।

উদাহরণতঃ, বাদশাহ্ আপন অনুগত ও প্রিয় ব্যক্তিকে কোন সময় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আপন মহল দেখাইয়া দেন। ইহা ধনাগার, ইহা গোপন পথ, ইহা আমার বেগমদের বাসস্থান এবং ইহা বিশ্রামাগার। কিন্তু কেহ যদি বাদশাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করে, "হুযূর, আপনার বেগমদের বাসস্থান কোন্‌টি? ধনাগার কোথায়?" তবে বাদশাহ্ তাহাকে ধমক দিয়া ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন।

যাক্, আমি গুপ্ততত্ত্বের স্বরূপ ও উহা জানিবার উপায় বলিয়া দিলাম। কাহারও আগ্রহ থাকিলে সে এই উপায় অবলম্বন করুক। সত্য বলিতেছি, আপনি আমার নির্দেশানুযায়ী কাজ করিলে এ বিষয় কাহাকেও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন থাকিবে না। সমস্ত গুপ্ততত্ত্বের দ্বার আপনাআপনিই খুলিয়া যাইবে। তখন আপনার অবস্থা হইবে—

بینی اندر خود علوم انبیاء ـ بے کتاب و بے معید و استا

(বীনী আন্দর খোদ ওলূমে আম্বিয়া + বে কিতাব ও বে মুয়ীদ ও উস্তা)

উস্তাদ ও কিতাবাদি ছাড়াই নিজের মধ্যে পয়গম্বরদের এল্‌ম দেখিতে পাইবে। যাঁহারা গুপ্ত-তত্ত্বের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা একমাত্র আমল ও আনুগত্যের মাধ্যমেই তাহা লাভ করিয়াছেন।

فهم و خاطر تیز کردن نیست راه ـ جز شکسته می نگیرد فضل شاه

(ফহম ও খাতের তেয করদান নীস্ত রাহ + জুয শেকাস্তা মী নাগিরাদ ফযলে শাহ্)

"বিবেক ও মেধা বৃদ্ধি করিয়া এইসব গুপ্ততত্ত্ব জানা যায় না; বরং বিনয় ও আনুগত্য দ্বারাই খোদার অনুগ্রহ লাভ করা যায়।" আরও বলেনঃ

هر کجا پستی است آب آنجا رود ـ هر کجا مشکل جواب آنجا رود

هر کجا دردے دوا آنجا رود ـ هر کجا رنجے شفا آنجا رود

(হরকুজা পস্তীস্ত আব আঁজা রাওয়াদ + হরকুজা মুশ্‌কিল জওয়াব আঁজা রাওয়াদ
হরকুজা দরদে দাওয়া আঁজা রাওয়াদ + হরকুজা রন্‌জে শেফা আঁজা রাওয়াদ)

যেখানে নিম্নভূমি সেখানেই পানি যায়। যেখানেই জটিলতা সেখানেই জওয়াবের আবির্ভাব হয়। যেখানে ব্যথা, সেখানেই ঔষধের আগমন। যেখানে বেদনা, সেখানেই আরোগ্য।

সুতরাং আনুগত্য ও দাসত্ব দ্বারা অনুগ্রহ লাভ হয়। নিজকে বিলীন করিয়া দিন। বিবেককে অযোগ্য ও অসম্পূর্ণ মনে করিয়া ত্যাগ করুন। মাওলানা বলেনঃ

سالها تو سنگ بودی دلخراش ـ آزموں را یك زمانے خاك باش

(সালহা তু সঙ্গ বূদী দিলখারাশ + আযমূঁ রা এক যমানে খাক বাশ)

www.BANGLAKITAB.com

বিবেকের আনুগত্যে বহুকাল তুমি পাষান-হৃদয় হইয়া রহিয়াছ; (কিন্তু বিবেক কিছুই বলিতে পারে নাই।) এখন কিছুদিন মাটি হইয়া দেখ তারপর কি হয়।

মাওলানা বলেনঃ

در بهاراں کے شود سر سبز سنگ ـ خاك شو تا گل بروید رنگ برنگ

(দরবাহারাঁ কায় শাওয়াদ সর সবয সঙ্গ + খাক শো তা গুল বরুইয়াদ রং বরং)

"বসন্তকালে পাথর কবে শস্য-শ্যামলা হইবে? মাটি হইয়া যাও রং বেরঙ্গের ফলফুল উৎপন্ন করিতে পারিবে।" অর্থাৎ, আনুগত্যের ফলে আপনার মধ্যে অভাবিত পূর্ণ জ্ঞান ফুটিয়া উঠিবে। বন্ধুগণ, ইহাই হইল শরীঅতের উচ্চ জ্ঞান লাভের নিয়ম।

বিবেক বিরোধঃ আজকাল রুচি বিগড়াইয়া যাওয়ার ফলে প্রত্যেকেই বিবেকের সাহায্যে শরীঅতের উচ্চ জ্ঞান লাভে ব্রতী হইয়া যায়। অথচ আমি কাহার পুত্র, আমার পিতা কে? বিবেক দ্বারা এতটুকুও জানা যায় না।

কানপুরের জনৈক ভদ্রলোক একবার পিতার নিকট পত্র লিখিলেন, "আপনি আমার পিতা তাহা কিরূপে জানিব? ইহার যুক্তি কি?" বাস্তবিকই ভদ্রলোক যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। মূর্খের পুত্র মূর্খ হইবে ইহাই যুক্তিসঙ্গত। গণ্ড মূর্খের পুত্র দার্শনিক হইয়া যাইবে কোন্ যুক্তিতে তাহা প্রমাণিত হয় না। ভদ্রলোকের এই প্রশ্নের একমাত্র জওয়াব এই যে, প্রসবকালে যে ধাত্রী রমণী উপস্থিত ছিল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লও এবং মাতাকে জিজ্ঞাসা কর যে, সে কিরূপে গর্ভবতী হইয়াছিল? অতএব, যে বিবেক দ্বারা পিতাকে পিতা বলিয়া প্রমাণ করা যায় না, উহা অকেজো ও অকর্মন্য নহে কি? ইহাই হইল বিবেকের অনুসরণের অনিষ্টতা। তাই সাধক কবি বলেনঃ

آزمودم عقل دور اندیش را ـ بعد ازیں دیوانه سازم خویش را

(আযমূদাম আকল দূর আন্দেশ রা + বাদ আযীঁ দেওয়ানা সাযম খেশ রা)

"বহুদর্শী বিবেককে যাচাই করার পর এখন পাগল সাজিয়া গিয়াছি।" 'পাগল' অর্থ এখানে বিনাদ্বিধায় চোখ বুজিয়া আনুগত্যকারী। কবির এই অবস্থা দেখিয়া কেহ বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসিলে তাহার উত্তরে বলেনঃ

ما اگر قلاش وگر دیوانه ایم ـ مست آں ساقی و آں پیمانه ایم

(মা আগর কাল্লাশ ওয়াগর দিওয়ানায়েম + মস্তে আঁ সাকী ও আঁ পায়মানায়েম)

'অর্থাৎ, কেহ হাসিলে তাহাকে বলিয়া দাও—আমাদের পাগলামী তোমাদের বুদ্ধিমত্তা হইতে শ্রেষ্ঠ।'

اوست دیوانه که دیوانه نشد ـ مر عسس را دید در خانه نشد

(উস্ত দিওয়ানা কেহ দিওয়ানা না শোদ + মর আসাসরা দীদ দরখানা না শোদ)

অর্থাৎ, "আমাদের মতে যে এরূপ পাগল নহে, সেই পাগল" কাজেই প্রত্যেক বিষয়কে বিবেকের সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করা বিকৃত রুচির পরিচায়ক বৈ কিছুই নহে। ইহার পরিণতি পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের ন্যায় না হইয়া পারে না। তিনি পিতার নিকটই পিতা হওয়ার যুক্তি চাহিয়া বসিলেন। খোদা ও রাসূলের সহিত যাহারা বিবেকের সাহায্যে বিরোধ উপস্থিত করে, তাহারা পিতার সহিত করিলে আশ্চর্যের কি আছে? তবে পিতার সহিত এরূপ করিলে পিতা অসন্তুষ্ট হয়।

www.BANGLAKITAB.com

সে এরূপ পুত্রকে ত্যাজ্য পুত্র করিয়া দেয়। দুনিয়াবাসীও তাহাকে মন্দ বলে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, খোদা ও রাসূলের নির্দেশাবলীর সহিত কেহ এরূপ করিলে পিতা তাহাকে বাধা দেয় না। দুনিয়াবাসীও এরূপ ব্যক্তিকে মন্দ বলে না; বরং সকলে মিলিয়া তাহাকে 'যুক্তিবাদী' উপাধিতে ভূষিত করে। বন্ধুগণ, ইনছাফ করুন—যে বিবেকের বিরোধ আপনি নিজের বেলায় সহ্য করিতে পারেন না, খোদা ও রাসূলের বেলায় তাহা কিরূপে সহ্য করা হয়?

আমি বলিতেছিলাম যে, কিছু সংখ্যক লোক বিবেকের সাহায্যে আকায়েদকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইয়াছে। তাহাদের মতে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্"-এর অর্থে বিশ্বাস স্থাপন করাই ঈমানের জন্য যথেষ্ট। আখেরাতের অন্যান্য বিষয়সমূহের বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরী নহে। কতিপয় লোক আরও সর্বনাশ করিয়াছে। তাহারা "মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" অংশটিও ঈমান হইতে উড়াইয়া দিয়াছে। কারণ, হাদীসে বর্ণিত হইয়াছেঃ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ —'যে ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলিবে, সে জান্নাতে যাইবে।' ইহাতে "মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্" নাই। কাজেই তাহারা বলে যে, তওহীদে বিশ্বাস স্থাপন করার পর যে কোন ধর্মাবলম্বী হউক, মোহাম্মদ (দঃ)-এর রেসালত বিশ্বাসী হউক বা না হউক সে মুক্তি পাইবে ও জান্নাতে যাইবে। এক্ষেত্রে আমি এই দলের নাম উল্লেখ করিতে চাই না। তবে তাহাদের যুক্তিদৃষ্টে একটি গল্প মনে পড়িয়া গেল।

রামপুরে জনৈক ছাত্র কোন প্রয়োজনবশতঃ আমার নিকট একটি ওযীফা চাহিল। আমি বলিয়া দিলাম, খুব বেশী পরিমাণে 'লা হাওলা' পড়িতে থাক। কিছু দিন পর ঐ ছাত্রের সহিত আবার দেখা হইলে সে বলিল, "আমি রীতিমতই ওযীফা পড়িতেছি; কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন উপকার পাই নাই।" আমি এমনিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ওযীফা পড়িতেছিলে? উত্তরে ছাত্রপ্রবর বলে, "আমি 'লা-হাওলা লা-হাওলা লা-হাওলা' এই ওযীফা পাঠ করি।" আমি বলিলাম, "তোমার এই লা-হাওলার প্রতিও লা-হাওলা।" যদি এই ছাত্রটির বুঝ ঠিক হইয়া থাকে, তবে উপরোক্ত দলের যুক্তিকেও ঠিক বলিতে হইবে। কিন্তু সকলেই জানে যে, লা-হাওলা বলিতে পূর্ণ একটি দো'আ বুঝায়। অর্থাৎ, لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ —তদ্রূপ বিসমিল্লাহ্ বলিলে একটি আয়াত এবং আলহামদু বলিলে একটি পূর্ণ সূরা বুঝায়। কুল হুয়াল্লাহ্ ও ইয়াসীন বলিলেও তেমনি এক একটি পূর্ণ সূরা বুঝায়।

নামাযে 'আলহামদু' পড়া ওয়াজিব এবং 'ইয়াসীন'-এর ছওয়াব দশ কোরআনের সমান বলিলে যদি কেহ ইহার অর্থ এইরূপ মনে করে যে, নামাযে শুধু আলহামদু শব্দটি পড়া ওয়াজিব এবং ইয়াসীন ইয়াসীন বলিতে থাকিলে দশ কোরআনের ছওয়াব পাওয়া যাইবে, তবে এরূপ ব্যক্তি বোকা নয় কি? এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বলিবে যে, আলহামদু ও ইয়াসীন শব্দগুলি পূর্ণ সূরারই পরিচয় প্রদান করে। তদ্রূপ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌র হাদীসটি পূর্ণ কলেমার পরিচয় দেয়; বরং পূর্ণ শরীঅতের পরিচয় বহন করে। অতএব, হাদীসের অর্থ এই যে, যে মুসলমান হইবে, সে জান্নাতী।

রেসালতে বিশ্বাস স্থাপনের প্রয়োজনীয়তাঃ এখন শরীঅতের অন্যান্য শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, মুসলমান হওয়ার জন্য মোহাম্মদ (দঃ)-এর রেসালত, জান্নাত ও দোযখ, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, তকদীর, পুলসিরাত, আমল ওযন, হিসাব-কিতাব ও নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ফরয হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করাও অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। কিন্তু এই সবগুলিকে বাদ দিয়া বিবেকের পূজারীরা উপরোক্ত ছাত্রের ন্যায় শুধু "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু"-কেই যথেষ্ট মনে করিয়া লইয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

বুলন্দ শহরের জনৈক পদস্থ কর্মচারীও এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন। তিনি শুধু তওহীদে বিশ্বাসী হওয়াকেই মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করিতেন। ইহা জানিতে পারিয়া আমি একদিন ওয়াযে বলিলাম, "যে ব্যক্তি রেসালতে বিশ্বাসী নহে, সে তওহীদেও বিশ্বাসী নহে।" রেসালত স্বীকার করা ব্যতীত তওহীদের কোন বাস্তব অর্থই হয় না। কারণ, তওহীদের অর্থ শুধু খোদাকে এক স্বীকার করিয়া লওয়া নহে; বরং তৎসহ তাঁহাকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটি হইতে মুক্ত এবং সমুদয় খোদায়ী গুণে গুণান্বিতও মনে করিতে হইবে। সত্যবাদিতাও একটি গুণ। অতএব, খোদাকে এই গুণে গুণান্বিত ও মিথ্যা হইতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ পবিত্র মনে করাও অত্যাবশ্যকীয় ফরয। অথচ যে ব্যক্তি রেসালত স্বীকার করে না, সে প্রকারান্তরে খোদাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে। কেননা, খোদা স্বয়ং মোহাম্মদ (দঃ)-কে "রাসূলুল্লাহ্" (আল্লাহ্র রাসূল) বলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি এ ব্যাপারে খোদাকে সত্যবাদী মনে করে না। ফলে সে এক দোষে খোদাকে দোষী সাব্যস্ত করে। ইহা তওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং "রেসালতে অবিশ্বাসী ব্যক্তি তওহীদে বিশ্বাসী হইতে পারে না।"

আমি আরও বলিলাম, "কেহ আমার এই যুক্তি খণ্ডন করিতে চাহিলে তাহাকে আমি দশ বৎসরের সময় দিতেছি।" শেষ পর্যন্ত উপরোক্ত কর্মচারী আপন ভুল স্বীকার করিয়া তওবা করিয়াছিল। পরবর্তী সাক্ষাতের সময় তিনি ছহীহ্ আকীদায় অটল ছিলেন। অতএব, আকায়েদ হইতে যাহারা রেসালতকে বাদ দেয়, তাহাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইয়া গেল।

কেহ কেহ আকায়েদ সংক্ষিপ্ত না করিলেও আমলে ছাটাই করিতে কসুর করে না। তাহাদের মতে মুসলমান হওয়াই মুক্তির জন্য যথেষ্ট। আর তওহীদ ও রেসালত স্বীকার করিলেই মুসলমান হওয়া যায়। সুতরাং আমল ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নাই। তাহাদের দলীল পূর্বোক্ত হাদীসঃ

من قال لا اله الا الله اى مع محمد رسول الله

ধর্মের অন্যান্য অঙ্গসমূহের গুরুত্বঃ বন্ধুগণ! এই বিষয়ের আলোচনা আসলে অনেক দীর্ঘ। কিন্তু এখন আমি একটি মোটা কথা আরয করিয়া দিতে চাই। শুধু 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লাহ্' কলেমাকে যথেষ্ট মনে করা এমন, যেমন কেহ ঈজাব কবূল করিয়া বিবাহ করিল, কিন্তু বিবি যখন খোর-পোষ চাহিল, তখন বলিতে লাগিল, "আমি তো তোমাকেই কবূল করিয়াছি, খোর-পোষ কবূল করিলাম কখন?" ইহা দেওয়া আমার কর্তব্য নহে। বলুন, এই ব্যক্তির এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য হইবে কি? কখনই নহে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বলিবে, আরে বোকা, বিবিকে কবূল করিলে তাহার প্রয়োজনীয় সবকিছু কবূল করা হয়। বন্ধুগণ, এমনিভাবে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্' কলেমা বলিলে ধর্মকে কবূল করা হয়। ইহাও শুধু ঈজাব-কবূলের ন্যায়, যাহাতে মযহাবের যাবতীয় অঙ্গের কবূল অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

ভাইসব! এসব নির্বুদ্ধিতা ছাড়া কিছুই নহে। আসলে আজকাল ইচ্ছা করিয়া নির্বুদ্ধিতা করা হয়। নতুবা খোদা ও রাসূলের সাথে যেরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহা বিবি অথবা সমাজের লোকদের সহিত করা হয় না কেন? মানিলাম—আপনি এমনি সূক্ষ্মদর্শী যে, যুক্তিযুক্ত কারণ ব্যতীত কোন কিছু মানেন না এবং পরিষ্কার কথায় কবূল না করিলে কোন কিছু পালনীয় মনে করেন না, তবে বিবাহের ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত কারণ তালাশ করেন না কেন এবং পরিষ্কার কথায় কবূল না করিয়াও খোর-পোষ দেওয়া বাধ্যতামূলক মনে করেন কেন? আসলে মানুষের সহিত কাজকারবার করার ব্যাপারে যুক্তিযুক্ত কারণ জানিয়া লওয়া উচিত ছিল, খোদার সহিত নহে। কিন্তু হইতেছে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূলের আদেশের ব্যাপারে ওযর-আপত্তি, কিন্তু

www.BANGLAKITAB.com

বিধি বেরাদরের বেলায় সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ। সুতরাং উপরোক্ত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর হাদীস দ্বারা আমলের অনাবশ্যকতা প্রমাণ করা নিতান্তই ভুল। ইহারা তো ঐ দাখালাল জান্নাহ্ দলভুক্ত লোক যাহারা আকায়েদের ছাটাই করে এবং আমলকে জরুরী মনে করে না।

আজকাল আরও এক প্রকার সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা আকায়েদ পুরাপুরিই মানে এবং আমলের আবশ্যকতাও অস্বীকার করে না; কিন্তু তাহারা আমলের মধ্যে ছাটাই করে। যেসব আমল তাহাদের কাছে সহজ মনে হয়, তাহারা উহা গ্রহণ করে এবং যেগুলিকে কঠিন মনে করে, সেইগুলি উড়াইয়া দেয়। এ ব্যাপারে তাহাদের সকলের স্বভাব এক রকম নহে। কেহ শারীরিক এবাদত সহজ ও আর্থিক এবাদত কঠিন মনে করে। তাহারা নামায, রোযা, তাস্বীহ, নফল এবাদত ইত্যাদি অবলম্বন করিয়া চেহারা-নমুনায় বুযুর্গ সাজিয়া যায়; কিন্তু ফরয হজ্জ আদায় করে না, যাকাতও দেয় না, কাজ কারবারে সতর্কতা অবলম্বন করে না। তাহাদের লেন-দেনও অত্যন্ত খারাপ। আবার কিছু সংখ্যক লোকের মতে টাকা-পয়সা ব্যয় করা সহজ। তাহারা হজ্জ করে, যাকাত দেয়; কিন্তু শারীরিক এবাদত তাহাদের মতে অত্যন্ত কঠিন। ফলে নামায, রোযা হইতে গা বাঁচাইয়া চলে। আরও একদল লোক শারীরিক ও আর্থিক উভয় প্রকার এবাদত পূর্ণরূপে পালন করে; কিন্তু আন্তরিক আনুগত্য বর্জন করিয়া বসিয়াছে। বাহ্যতঃ তাহারা খুবই পবিত্র, কিন্তু অন্তর নানারূপ অহংকার, হিংসা, রিয়া ও আত্মম্ভরিতায় পরিপূর্ণ। তাহাদের মধ্যে নামে মাত্র খোদাভীতি আছে; কিন্তু উহাকেও তাহারা জরুরী মনে করে না। কিছু সংখ্যক লোক এসব বিষয়ে লক্ষ্য করিলেও তাহাদের সামাজিকতা অত্যধিক নোংরা। খোদার যিকর-আযকার করে বটে, কিন্তু অপরকে কষ্ট দিতে তাহাদের বাধে না।

মোটকথা, যে কাজকে সহজ দেখিয়াছে, সে উহাই গ্রহণ করিয়াছে এবং যাহাতে কিছু পরিশ্রম দেখিয়াছে, উহা ত্যাগ করিয়াছে। আজকাল বিজ্ঞানের যুগ। ফলে প্রত্যেক জিনিসের সার বাহির করার প্রবণতা দেখা যায়। মুসলমান ভাইগণ আমলেরও সার বাহির করিয়া ফেলিয়াছে। বন্ধুগণ, সারের সার বাহির করা যায় না। অথচ ধর্ম সম্পূর্ণই সার, ইহার প্রত্যেকটি অঙ্গই অপরিহার্য। ইহার সার বাহির করার অর্থ হইবে জরুরী অঙ্গ বাদ দেওয়া।

যেমন, কেহ মানুষের সারাংশ বাহির করার ইচ্ছায় যদি তাহার একটি হাত কাটিয়া ফেলে কিংবা একটি চক্ষু উপড়াইয়া ফেলে এবং একটি কর্ণ বন্ধ করিয়া দেয়, তবে ইহাকে সারাংশ বাহির করা বলা যাইবে কি? কখনই নহে। এক্ষেত্রে ইহাই বলা হইবে যে, মানুষটির জরুরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উড়াইয়া দিয়া তাহাকে বেকার করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

মুসলমান ভাইগণ ধর্মকেও এই অবস্থায় ফেলিয়া দিয়াছে। কাহারও আমল খুবই ভাল; কিন্তু আকায়েদের বেলায় কোরআন ও হাদীস অগ্রাহ্য করিয়া বেদআতের আশ্রয় লইয়াছে। তাসত্ত্বেও নিজকে দ্বীনদার বলিয়া যাহির করে। আবার কাহারও আকায়েদ ঠিক; কিন্তু আমলের বেলায় ত্রুটির অন্ত নাই। তাহারাও সুন্নতের অনুসারী বলিয়া গর্ব করিতে কসুর করে না। মোটকথা, আমাদের মধ্যে উপরোক্তরূপ বিভিন্ন মতাবলম্বী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। আমার মতে এ সমস্ত অনিষ্টের আসল কারণ এই যে, তাহারা ধর্মের অঙ্গসমূহ সম্যক বুঝিতে পারে নাই।

ধর্মের অঙ্গসমূহের বিবরণঃ বন্ধুগণ! মনোযোগ দিয়া শুনুন! ধর্মের অঙ্গ পাঁচটি। (১) আকায়েদ। অর্থাৎ, অন্তরে ও মুখে এইরূপ স্বীকার করা যে, আল্লাহ্ ও তদীয় রাসূল আমাদিগকে যে যে বিষয়ের সংবাদ দিয়াছেন, তাহা সমস্তই তাহাদের বর্ণিত আকারে সত্য। (আকায়েদের কিতাব-

www.BANGLAKITAB.com

সমূহে এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে।) (২) এবাদত। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। (৩) পারস্পরিক মোআমালা অর্থাৎ বিবাহ, তালাক, অন্যায়ের শাস্তি, কাফ্ফারা, বেচা কেনা, ইজারা, কৃষিকাজ ইত্যাদির হুকুম আহ্কাম। এই সব বিষয় ধর্মের অঙ্গ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, শরীঅত কৃষিকার্যের নিয়মাবলী শিক্ষা দেয় বা কি কি জিনিসের ব্যবসা করিতে হইবে, তাহা বলিয়া দেয়; বরং এসব ব্যাপারে শরীঅত আমাদিগকে শিক্ষা দেয় যে, কাহারও প্রতি অন্যায়-অবিচার করিবে না, যেসব মোআমালায় ঝগড়ার সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা করিবে না। মোটকথা, কোন্‌টি জায়েয ও কোন্‌টি না-জায়েয, তাহাই বলিয়া দেয়। (৪) সামাজিকতা। অর্থাৎ উঠাবসা, দেখাসাক্ষাৎ, মেহ্মান হওয়া কাহারও বাড়ীতে যাওয়া ইত্যাদি কাজ কিরূপে করিতে হইবে? স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজন, অপরিচিত ও চাকর-বাকর কাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ইত্যাদি। (৫) তাছাউফ। এই নামটি ভয়াবহ বটে। কারণ, আজকাল সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, তাছাউফের পথে গেলে বিবি বাচ্চা, বিষয়-আশয় ইত্যাদি সব ত্যাগ করিতে হয়। জানিয়া রাখুন, ইহা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। যে সব মূর্খ ছুফী তাছাউফের স্বরূপ জানে না, তাহারাই এইরূপ প্রচার করিয়া বেড়ায়। এই পঞ্চম অঙ্গটিকে শরীঅতে "এছলাহে নফ্‌স" বা আত্মসংশোধন নামে অভিহিত করা হয়।

উপরোক্ত পাঁচটি অঙ্গের সমষ্টির নাম ধর্ম। ইহাদের যে কোন একটি বাদ পড়িলে পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হইবে না। যেমন, কাহারও একটি হাত না থাকিলে তাহাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ বলা যায় না।

আমরা উপরোক্ত পাঁচটি অঙ্গ পালনে কতদূর যত্নবান হইয়াছি, এক্ষণে তাহাই দ্রষ্টব্য। এ সম্পর্কে পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কেহ কেহ আকায়েদ ও এবাদত নামক অঙ্গগুলি বাদ দিয়াছে, আবার কেহ কেহ লেন-দেনের ব্যাপারকে ধর্মের অন্তর্ভুক্তই মনে করে না। বড় বড় পরহেযগার ব্যক্তিও এই মারাত্মক দোষে দোষী। তাহাদের ব্যবহারে ইহা ফুটিয়া উঠে। তাহারা নামায-রোযার মাসআলা আলেমদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লয়। কিন্তু লেন-দেনের ব্যাপারে কোনরূপ জিজ্ঞাসাবাদ করে না। উদাহরণতঃ সম্পত্তি খরিদ করা কিংবা ওয়ারিসী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ বন্টনের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র শরীঅতসম্মত কিনা, তাহা আলেমদের নিকট জানিবার চেষ্টা করা হয় না। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাহারা এসব ব্যাপারকে ধর্মের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন না। অথচ এইগুলি যে ধর্মের অঙ্গ, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

পবিত্র কোরআনে পারস্পরিক ঋণ আদান-প্রদান সম্পর্কিত আয়াত রহিয়াছে। উহাতে শুধু ঋণের ব্যাপারে বহু বিধি-নিষেধ বর্ণিত হইয়াছে। যেমন, আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা নির্ধারিত মিয়াদে ঋণ আদান-প্রদান করিলে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া লও। নিজে লিখিতে অক্ষম হইলে অন্যের দ্বারা লিখাইয়া লও।" লেখক সম্বন্ধে বলেনঃ

وَلَايَأْبَ كَاتِبٌ اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللهُ فَلْيَكْتُبْ

অর্থাৎ, "কোন লেখক লিখিতে অস্বীকার করিতে পারিবে না।" কোন লেখক পাওয়া না গেলে দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী বানাইয়া লইতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। প্রয়োজন দেখা দিলে সাক্ষীদিগকে অবশ্যই সাক্ষ্য দিতে হইবে। সাক্ষ্য গোপন করা ভীষণ অন্যায়। ইহার শাস্তির কথাও কোরআনে উল্লেখ রহিয়াছে। কোরআন শরীফের এমনিভাবে আরও বহু লেন-দেনের ব্যাপারে বিধি-ব্যবস্থা রহিয়াছে। হাদীস শরীফে আরও বেশী আছে। এছাড়া ইসলামী ফেকাহ্ শাস্ত্রে এগুলিকে এত বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহার সহিত অন্য কোন আইন-শাস্ত্রের তুলনা চলে না।

www.BANGLAKITAB.com

কুসংসর্গের প্রতিক্রিয়াঃ কিছু সংখ্যক লোক আলেমদের প্রতি দোষারোপ করে যে, তাহারা না-জায়েয ছাড়া আর কিছু জানে না। দলীল দস্তাবেজ দেখা না-জায়েয কোন চাকুরীর কথা জিজ্ঞাসা করা না-জায়েয। মনে হয়, তাহারা একমাত্র না-জায়েযই শিক্ষা করিয়াছে। আলেমদের প্রতি এইরূপ দোষারোপ ব্যাপক হারেই শুনা যায়। কেহ কেহ আবার আরও অগ্রসর হইয়া বলে যে, আসলে ধর্মই বড় কঠিন ব্যাপার। (বলা বাহুল্য, প্রথমোক্ত দল আলেমদের প্রতি দোষারোপ করে, আর দ্বিতীয় দল খোদা ও রাসূলকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়া বসে।) উপরোক্ত আলোচনায় এই উভয় দলের জওয়াব হইয়া গিয়াছে।

এই ধরনের লোকদের কাহিনী কি বলিব? ভয়ও হয়, আবার ক্ষোভও সামলানো যায় না। কিছুদিন পূর্বে লক্ষ্ণৌতে মুসলমানদের একটি সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। মুসলমানদের অবনতির কারণ নির্ণয় ছিল সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়। সভাশেষে স্থিরীকৃত হয় যে, ইসলামই মুসলমানদের অবনতির একমাত্র কারণ।

বন্ধুগণ, এই শ্রেণীর মুসলমানরাই জোর গলায় দাবী করে যে, আমরাই ইসলামের খাঁটি অনুগামী, আমরাই ইসলামের রক্ষক। আবার তাহারাই প্রস্তাব পাশ করে যে, ইসলামই অবনতির মূল কারণ। আফ্‌সোস! যে ইসলামের বদৌলতে ছাহাবায়ে কেরাম অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, আজ সেই ইসলামকেই অবনতির কারণরূপে আখ্যায়িত করা হয়। খোদার কসম! তাহারা ইসলামকে বুঝেই নাই। আমল করা তো দূরেরই কথা। যাহারা ইসলামকে সম্যক বুঝিয়া তদনুযায়ী আমল করিয়াছে, তাহাদের কখনও অবনতি হয় নাই। অবশ্য যাহারা আমল করে না, তাহাদেরই অবনতি হইয়াছে। তবে ইহার কারণ ইসলাম নহে; বরং ইসলামকে বর্জন করা।

এই শ্রেণীর লোকদের সংসর্গে থাকার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলিতেছিঃ একবার আমি বেরিলী গিয়াছিলাম। তথায় জনৈক বৃদ্ধ তাহার নাতীকে লইয়া আমার নিকট আসিয়া বলিল, "হুযূর! এ নামায পড়ে না। তাহাকে কিছু নছীহত করুন।" আমি ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, তুমি নামায পড় না কেন?" সে উত্তরে বলিল, "আমি খোদার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান; সুতরাং কাহার উদ্দেশ্যে নামায পড়িব?" এই পর্যন্ত বলিয়াই তাহার চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইয়া গেল। আমি বৃদ্ধকে বলিলাম, "আপনি নামাযের চিন্তা করেন—বাচাধনের তো ঈমানই নাই। আগে ইহার প্রতিকার করা উচিত।" বৃদ্ধ আমাকেই প্রতিকারের পন্থা বলিয়া দিতে অনুরোধ করিল। আমি বলিলাম, "সে কোথায় লেখাপড়া করে?" উত্তরে জানা গেল যে, মুসলমান ছেলেদের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি কলেজে পড়ে। আমি বলিলাম, "তাহাকে কলেজের পরিবর্তে কোন গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি করিয়া দিন।" বৃদ্ধ তখন ইহার রহস্য না জানিলেও আমার কথামত কাজ করিল।

পর বৎসর আমি আবার বেরিলী পৌঁছিয়া জানিতে পারিলাম যে, ছেলেটি পাক্কা মুসলমান এবং খুব নামায পড়ে। তখন কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, কলেজে পড়িয়া ছেলেটির ইসলাম দুর্বল এবং গভর্নমেন্ট স্কুলে যাইয়া তাহার ইসলাম বাঁচিয়া গেল কিরূপে? অথচ এই কলেজে শুধু মুসলমান ছাত্ররাই লেখাপড়া করে। এখানে ইসলাম আরও শক্তিশালী হওয়ার কথা। অপরপক্ষে গভর্নমেন্ট স্কুলে হিন্দু মুসলমান সকল শ্রেণীর ছাত্রই লেখাপড়া করে।

আমি বলিলাম, "কলেজে যে সব মুসলমান ছাত্ররা লেখাপড়া করে, তাহারা সকলেই স্বাধীন মনোভাবাপন্ন। সেখানে দিবারাত্র এই এক ধরনের লোকের সংসর্গে থাকিতে হয়। ফলে সকলের অবস্থাই এক রকম হইয়া যায়। কেননা, বাহ্যতঃ সকলেই মুসলমান হওয়ার কারণে পরস্পরের

www.BANGLAKITAB.com

ঘৃণা করার কোন হেতু থাকে না। এমতাবস্থায় সংসর্গের প্রভাব শীঘ্র প্রতিফলিত হইতে কোন বাধা থাকে না। গভর্নমেন্ট স্কুলের অবস্থা এরূপ নহে। মুসলমান ছেলেরা হিন্দু ধর্মকে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করে। কাজেই হিন্দুদের সংসর্গের প্রভাব মুসলমান ছেলেদের মধ্যে প্রতিফলিত হইতে পারে না। তাছাড়া পারস্পরিক ঘৃণার কারণে উভয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়িয়া উঠে। তাই মুসলমান ছেলেরা নিজেদের ধর্মের উপর দৃঢ় হইয়া যায়।" ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আলেমগণ প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী পড়াইতে নিষেধ করেন না; বরং ধর্মীয় বিশ্বাস নষ্ট করিতে বাধা দেন।

কেহ কেহ বলে, আজকাল আমরা ইংরেজী শিক্ষার সহিত ধর্মীয় শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়াছি। সুতরাং এখন ইংরেজী শিক্ষায় দোষ নাই। বন্ধুগণ, শুধু শিক্ষা দেওয়াই যথেষ্ট নহে। কারণ, যাহারা শিক্ষাদাতা তাহারাও স্বাধীন মনোভাবাপন্ন। ধর্মীয় শিক্ষার সাথে সাথে সৎসংসর্গের ব্যবস্থা করা দরকার। বেশী সম্ভব না হইলে কমপক্ষে ছুটির দিনগুলিতেই ছেলেদিগকে কোন বিচক্ষণ আলেমের সংসর্গে পাঠাইয়া দেওয়া কর্তব্য।

আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিঃ আমি আপনাদিগকে ধর্মের খাতিরে অমূল্য সময় নষ্ট করিতে বলি না। কারণ, আজকালকার অবস্থাদৃষ্টে এরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। আজকাল আল্লাহ্‌র নামে দেওয়ার জন্য যতসব নিকৃষ্ট জিনিস পছন্দ করা হয়। কাজেই আপনি অমূল্য সময় খোদার জন্য কিরূপে ব্যয় করিতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। একদা জনৈক মহিলা শিরণী পাকাইয়া একটি বাসনে উঠাইয়া রাখিয়াছিল। ঘটনাক্রমে একটি কুকুর উহাতে মুখ দেয়। মহিলাটি অপর একটি বাসনে ঐ শিরণী ঢালিয়া তাহা ছেলে দ্বারা মসজিদের মোল্লার নিকট পাঠাইয়া দিল। মোল্লাজী শিরণী দেখিয়া আনন্দচিত্তে খাওয়া শুরু করিয়া দিলেন। ঘটনাক্রমে কুকুর যে দিকে মুখ দিয়াছিল, তিনি ঐ দিক হইতেই খাইতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ছেলেটি বলিতে লাগিল, "মোল্লাজী, এদিক হইতে খাইবেন না—এদিকে কুকুর মুখ দিয়াছিল।" ইহা শুনামাত্রই মোল্লাজী রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং শিরণীসহ বাসনটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। ফলে উহা ভাঙ্গিয়া খান খান হইয়া গেল। তখন ছেলেটি, "হায়, আম্মা আমাকে মারিবে"—বলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মোল্লাজী বলিলেন, "ওরে, কাঁদিস কেন? সামান্য মাটির বাসন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাতে কি হইল?" "ছেলে বলিল, 'তা নয় গো, উহাতে আম্মা আমার ছোট ভাইকে পায়খানা করাইত।" এই নূতন আবিষ্কারে মোল্লাজীর বমি আসার উপক্রম হইল! (কেননা, পাত্র ও পাত্রস্থিত বস্তু উভয়টিই নূরে পরিপূর্ণ ছিল!) এই হইল আমাদের অবস্থা। আমরা নাপাক ও নিকৃষ্ট বস্তুই খোদার নামে দিতে পছন্দ করি। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা মসজিদের মোল্লাদের সহিত এইরূপ ব্যবহার করি—আবার আমরাই তাহাদিগকে হেয় ও ঘৃণেয় মনে করি। আরে ভাই, যখন আপনি সুস্বাদু ও উৎকৃষ্টতম খাদ্য খান, তখন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন কি? যখন নিজের খাওয়ার উপযুক্ত না থাকে, তখন তাহাদের পালা আসে। এখানেই শেষ নয়, তাহাদের বেতনও এত অল্প ধার্য করা হয় যে, বেচারাদের পক্ষে শুকনা রুটি যোগাড় করাই মুশ্‌কিল হইয়া পড়ে। সুতরাং তাহারা লোভী হইবে না তো আর কি হইবে?

এই জন্যই আমি বলি, মহল্লায় কোন ধনী ব্যক্তি অসুস্থ হইলে মসজিদের মোয়ায্‌যিন হয়তো তাহার আরোগ্য লাভের জন্য দো'আ করিবে না। সে মনে মনে ইহাই কামনা করিবে যে, সে মরিলে ভালই হয়, চল্লিশা, ফাতেহা ইত্যাদির নিমন্ত্রণ খুব পেট ভরিয়া খাওয়া যাইবে। কারণ,

www.BANGLAKITAB.com

আনন্দোৎসবে বেচারাদিগকে কেহ জিজ্ঞাসা করে না। কেবলমাত্র মৃত্যুজনিত অনুষ্ঠানাদিতেই তাহাদিগকে স্মরণ করা হয়। অতএব, ইহার অনিবার্য পরিণাম এই দাঁড়ায় যে, তাহারা এই সব সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকিবে।

এই জাতীয় লোভের চূড়ান্তরূপ সম্বন্ধে একটি ঘটনা বলি। কেরানা শহরের জনৈক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার কাফনের অতিরিক্ত চাদরটি গোরস্থানে নিযুক্ত খাদেমকে না দিয়া একজন দরিদ্রকে দেওয়া হইল। ইহাতে খাদেম আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলিল, "ইহা আমার হক। সুতরাং আমাকেই দেওয়া হউক।" কেহ কেহ বলিল, আরে ভাই, সব সময় তোমাকেই দেওয়া হয়। আজ না হয় এই গরীবকেই দেওয়া হইল—তাহাতে ক্ষতি কি? উত্তরে খাদেম বলিল, বাঃ, হুযূর! 'খোদা খোদা' করিতে করিতে এই দিনের মুখ দেখি। ইহাতেও আপনারা আমার হক অন্যকে দিয়া দেন। ইহা শুনিয়া সকলে বলিয়া উঠিল, "আরে হতভাগা, তাহা হইলে দেখা যায়, তুই সর্বদা আমাদের মৃত্যু কামনা করিস এবং এজন্য মনে মনে দো'আ করিতে থাকিস।" উত্তরে খাদেম এদিক-ওদিকের কথা আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে কি হয়, তাহার মনের কথা কাহারও জানিতে বাকী রহিল না। বন্ধুগণ, ইহাতে তার দোষ কি? এই দুঃসময় ছাড়া আপনারা যখন তাহার দিকে ফিরিয়াই তাকান না, ইহাই যখন তাহার একমাত্র আমদানির পথ, তখন সে ইহার ওযীফা না পড়িয়া কি করিবে?

আমরা অকেজো জিনিসই খোদার পথে দিয়া থাকি। এই অবস্থা দৃষ্টে সময় সম্বন্ধেও আমি বলি যে, ছুটির বেকার ও অতিরিক্ত সময়টিই খোদার পথের জন্য বাহির করিয়া লউন। ছুটির সম্পূর্ণ সময় দিতে না পারিলে অন্ততঃ অর্ধেকই দিন এবং ইহার মধ্যে আপন সন্তানদিগকে বিচক্ষণ আলেমের সংসর্গে পাঠাইয়া দিন। কারণ, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا "বুযুর্গ ব্যক্তিদের সুদৃষ্টির ফলেই ধর্মকর্মে সুমতি হয়।" শুধু পুস্তক পড়াইলেই ধর্মভাব জাগ্রত হয় না। আমি ইংরেজী পড়াইতে নিষেধ করি না। তবে এই কথা বলি যে, আলেমদের সহিত পরামর্শ করিয়া ছেলেদের ধর্ম রক্ষারও একটা ব্যবস্থা করুন। আমি উপরোক্ত ছেলেটির সংশোধনের নিমিত্ত যে নিয়ম বলিয়াছিলাম, তাহাতে খোদার ফযলে উপকার হইয়াছে।

আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমেই ইংরেজী শিক্ষাকে হারাম বলিবে, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া আজকাল আলেমদের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয় না; অথচ দুনিয়াদারীর সহিত আলেমদের কোন শত্রুতা নাই। তাঁহারা চান, আপনি ধর্মকে জলাঞ্জলি না দিয়া ধর্ম বাঁচাইয়া দুনিয়া উপার্জন করুন।

জায়েয ও না-জায়েযের আলোচনা ঃ আলেমগণ না-জায়েয ব্যতীত আর কিছু জানে না—এই অপবাদের উত্তর এই যে, আপনারাই যখন বাছিয়া বাছিয়া না-জায়েয বিষয়েরই প্রশ্ন করেন, তখন তাহাদের পক্ষে না-জায়েয বলা ছাড়া উপায় কি? ব্যবসা ও কৃষি বিষয়ে জায়েয পন্থা কি কি, কোন্ কোন্ চাকুরী জায়েয, আলেমদিগকে এই জাতীয় প্রশ্ন করিয়া দেখুন, তাহারা আপনার সম্মুখে জায়েযের বিরাট দফতর খুলিয়া ধরিবে।

উদার নীতির অর্থ এই নয় যে, উহাতে নিষিদ্ধ বিষয়ের কোন অস্তিত্ব নাই। জগতে এই ধরনের কোন আইন নাই, থাকিলেও তাহাকে প্রকৃতপক্ষে আইন বলা যাইতে পারে না। উদার নীতির অর্থ হইল এই যে, উহাতে না-জায়েয বিষয়ের তালিকা অল্প এবং জায়েয বিষয়ের তালিকা বেশী। আপনি মনোযোগ সহকারে শরীঅতের আইন অধ্যয়ন করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, উহার

www.BANGLAKITAB.com

প্রত্যেকটি অধ্যায়ে না-জায়েয বিষয় অপেক্ষা জায়েয বিষয় অনেক বেশী। তবে কেহ শুধু না-জায়েয বিষয়গুলি লইয়াই প্রশ্ন করিলে স্বভাবতঃই উহার উত্তরে শুধু না-জায়েয বলা হইবে।

আলেমদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইলেও তাহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করা উচিত। তাহাদের না-জায়েয ফতওয়া অনুযায়ী আমল না করিলেও জিজ্ঞাসা করিলে আপনার উপকার হইবে। তাহা এই যে, জিজ্ঞাসা না করিয়া আমল করিলে হয়তো আপনি হারামকে হালাল ভাবিয়া করিতেন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করার পর হারামকে হারাম ভাবিয়াই করিবেন। প্রথমোক্ত অবস্থায় গোনাহ্ করিয়াও হয়তো নিজকে গোনাহ্গার মনে করিতেন না, ইহা অত্যন্ত মারাত্মক। শেষোক্ত অবস্থায় আপনি নিজকে গোনাহ্গার মনে করিতে পারিবেন। ফলে কোন সময় তওবার তওফীক হইয়া যাইতে পারে।

লেন-দেন শুদ্ধ হইলেও আবার কেহ কেহ সামাজিকতার প্রতি চরম উদাসীন হইয়া রহিয়াছে। কিছু সংখ্যক লোক যেরূপ প্রাচীন সভ্যতা গ্রহণ করে নাই, তদ্রূপ আধুনিক সভ্যতাকেও গ্রহণ করে না। আবার কেহ কেহ কেবল আধুনিক সভ্যতাকেই সম্বল বানাইয়া লইয়াছে। জায়েয না-জায়েযের কথা বাদ দিলেও ইহাতে একটি অপকারিতা এই যে, এই সভ্যতা গ্রহণ করায় তাহাদের বহু বিঘোষিত ও বিপুল প্রশংসিত জাতীয়তাবাদ পণ্ড হইয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয়, তাহারা মুখে নিজদিগকে জাতির হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু কাজেকর্মে এই জাতীয়তাবাদের মুলোৎপাটনে লিপ্ত রহিয়াছে। তাহাদের আকৃতি ও কথাবার্তায় কোন ইসলামী বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না; বরং তাহারা আপন জাতি হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাহাদের অবস্থা এইরূপঃ

یکے بر سر شاخ و بن می برید ـ خداوند بستاں نگہ کرد و دید

(একে বর সরে শাখ ও বুন মী বুরীদ + খোদাওয়ান্দে বুস্তাঁ নেগাহ্ করদ ও দীদ)

অর্থাৎ, "কেহ ডালের মাথায় বসিয়া উহার গোড়া কাটিতেছে। বাগানের মালিক, সেদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল.....।

ইসলামী সভ্যতাঃ এতদ্ব্যতীত বিজাতীয় সামাজিকতা অবলম্বন করার অর্থ এই যে, (নাঊযু-বিল্লাহ্) ইসলামে কোন সামাজিকতা নাই। থাকিলেও তাহা উত্তম ও যথেষ্ট নহে। ইহা ছাড়া অন্যের সামাজিকতা অবলম্বন করার আর কি কারণ থাকিতে পারে? খোদার কসম, ইসলামী সামাজিকতার ন্যায় উত্তম সামাজিকতা জগতের কোথাও দৃষ্ট হয় না। তবে সামাজিকতার অর্থ বাদ্যযন্ত্রাদি লইয়া বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান করা বা অহঙ্কার উপকরণ সংগ্রহ করা নহে। এগুলি সামাজিকতার মূলে কুঠারাঘাত করে। কারণ, অহঙ্কারী ব্যক্তি অন্যের তুলনায় বড় সাজিয়া থাকিতে পছন্দ করে। এমতাবস্থায় তাহার মধ্যে অন্যের প্রতি সহানুভূতি কোথা হইতে জন্ম লাভ করিবে? ইসলাম যে সামাজিকতা শিক্ষা দেয়, উহাতে মানুষের মনে বিনয় ও নম্রতা উৎপন্ন হইয়া থাকে। অভিজ্ঞতার আলোতে দেখা গিয়াছে যে, বিনয় ও নম্রতা ব্যতীত পারস্পরিক ঐক্য ও সহানুভূতি সৃষ্টি হইতে পারে না। অথচ ইহা সামাজিকতার ভিত্তি। অতএব, প্রকৃত সামাজিকতা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা কেবল ইসলামের মধ্যেই আছে।

উদাহরণতঃ পানাহার সম্পর্কে ইসলামী সামাজিকতা লক্ষ্য করুন। রাসূলে খোদা (দঃ) শুধু মুখেই বলেন নাই; বরং স্বয়ং কার্যেও পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। তিনি বলেনঃ

www.BANGLAKITAB.com

أكل كما يأكل العبد "দাস যেভাবে খায়, আমিও সেইভাবে খাই।" তিনি দুই পায়ের উপর ভর দিয়া হাঁটু খাড়া করিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া বসিয়া আহার করিতেন। এখন মুসলমান ভাইদের বসার ভঙ্গি দেখুন। উহা হইতে পরিষ্কার অহঙ্কার ফুটিয়া উঠে। তাহাদের বসার ও রাসূলে খোদা (দঃ)-এর বসার ভঙ্গি পরস্পর তুলনা করিয়া দেখুন, কোন্‌টি যুক্তিসঙ্গত?

বিষয়টি একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝুন। মনে করুন, আপনি পঞ্চম জর্জের দরবারে গেলেন। তিনি আপনাকে কোন খাদ্যবস্তু দিয়া বলিলেন, "আমার সম্মুখেই ইহা খাও।" জিজ্ঞাসা করি, তখন আপনি কিভাবে খাইবেন? সেখানেও কি আপনি টেবিলের অপেক্ষা করিবেন এবং আসন গাড়িয়া বসিবেন, না দাসের ন্যায় বিনয়াবনত হইয়া ঝুঁকিয়া খাইবেন?

আরও মনে করুন, তখন আপনাকে যে সব খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হয়, যদি উহাদের কোনটি আপনার রুচিবিরুদ্ধ হয়, সত্য করিয়া বলুন, তখন কি আপনি উহা অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া খাইবেন? নিশ্চয়ই নহে। আপনি উহা প্রবল আগ্রহ সহকারে খাইবেন এবং কোনও রকমে অনিচ্ছা প্রকাশ পাইতে দিবেন না।

ইহাই হইতেছে ইসলামী সভ্যতা। হুযূর (দঃ) আহার কালে প্রবল বাসনা প্রকাশ করিয়া তাড়াতাড়ি আহার করিতেন। দুঃখের বিষয়, আমরা অত্যন্ত গর্বিত ভঙ্গিতে আহার করিয়া থাকি। বন্ধুগণ, খাদ্যদ্রব্যের আসল স্বরূপ অবগত না হওয়ার কারণেই আমরা এইরূপ করিয়া থাকি। যদি আমরা মনে করিতাম যে, প্রবল পরাক্রমশালী খোদার দরবার হইতে আমাদিগকে এই বস্তুটি খাইতে দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি আমাদিগকে দেখিতেছেন, তবে আমরা আপনাআপনিই রাসূলে খোদা (দঃ)-এর বর্ণিত রীতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতাম।

হাদীসে বর্ণিত আছে, হাত হইতে লোক্‌মা পড়িয়া গেলে তাহা উঠাইয়া পরিষ্কার করিয়া খাইয়া ফেলিবে। কিছু সংখ্যক অহঙ্কারী ব্যক্তি ইহাকে সভ্যতা বিরোধী মনে করে। আমি উপরোক্ত উদাহরণের মধ্যেই জিজ্ঞাসা করি, যদি পঞ্চম জর্জ প্রদত্ত খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ পড়িয়া যায়, তখন আপনি কি করিবেন? নিশ্চয়, আপনি উহা উঠাইয়া সসম্মানে খাইয়া ফেলিবেন। বন্ধুগণ, অন্তরে খোদার মহত্ত্ব বিরাজমান থাকিলে সব সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়। আসলে আমরা লক্ষ্য করি না যে, খোদা আমাদিগকে দেখিতেছেন। রাসূলে খোদা (দঃ) এদিকে লক্ষ্য করিতেন। আমাদেরও চক্ষু খুলিয়া গেলে আমরাও ঐরূপ করিব যেরূপ হুযূর (দঃ) করিয়াছেন। তবে যে সব স্থানে চক্ষু খোলে এবং অন্তরে কাহারও মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তথায় এখনও আপনাদের ঐরূপ ব্যবহারই চলিতেছে।

ইসলামে পূর্ণরূপে সামাজিকতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও অন্যের নিকট হইতে ইহা ধার করার কি প্রয়োজন? অথচ মযহাবী আত্মসম্মান ও জাতীয় মর্যাদাবোধের তাগাদা এই ছিল যে, ইসলামী সামাজিকতা অসম্পূর্ণ হইলেও অন্যের সামাজিকতা হইতে মুখ ফিরাইয়া রাখা। জনৈক কবি বলেনঃ

کهن خرقۀ خویش پیراستن — به از جامۀ عاریت خواستن

(কুহন খেরকায়ে খেশ পায়রাস্তান + বেহ্‌ আয জামায়ে আরিয়ত খাস্তান)

"অন্যের নিকট হইতে জামা ধার করা অপেক্ষা আপন ছেঁড়া লেবাস পরিধান করা উত্তম।"

কথায় বলে, নিজের পুরাতন কম্বল অন্যের শাল অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। স্বীয় উত্তম চাদর

www.BANGLAKITAB.com

খুলিয়া ফেলিয়া অন্যের ছেঁড়া কম্বল পরিধান করা বুদ্ধিমানের কাজ নহে। পোশাক-পরিচ্ছদের বেলায়ও মুসলমান ভাইগণ অন্যের রীতিনীতি অনুসরণ করিতেছে; অথচ এ ব্যাপারেও ইসলামের সহিত অন্য কোন জাতির তুলনা চলে না। ইহা সুস্পষ্ট যে, বেশভুষার ব্যাপারে ইসলামে জায়েযের তালিকা না-জায়েযের তালিকা হইতে অনেক বড়। অথচ বিজাতির অনুকরণপ্রিয় ভাইদের সামাজিকতার ব্যাপার ইহার বিপরীত। অর্থাৎ, অনুমোদিত তালিকা ছোট এবং অননুমোদিত তালিকা বড়।

আশ্চর্যের বিষয়, আপনি দিবারাত্র উদারতা উদারতা বলিয়া চীৎকার করেন এবং সামাজিকতা ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতা থাকা উচিত নয় বলিয়া আলেমদিগকে উপদেশ দেন, অথচ কার্যক্ষেত্রে আপনি এমন এক সামাজিকতা গ্রহণ করিয়াছেন, যাহাতে শুধু সঙ্কীর্ণতাই সঙ্কীর্ণতা। অনুমোদিত বস্তু অপেক্ষা অননুমোদিত বস্তু যেখানে বেশী সেখানে উদারতা কোথায়? আপনি নিজেই উদারতার প্রয়োজন বলিয়া আইন রচনা করেন, আবার নিজেই উহা ভঙ্গ করেন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায় যে, একমাত্র শরীঅতের সামাজিকতার মধ্যেই পূর্ণ আজাদী বিদ্যমান। কেননা, উহাতে জায়েয বিষয় বেশী এবং না-জায়েয বিষয় কম। পক্ষান্তরে আধুনিক সামাজিকতায় শুধু সঙ্কীর্ণতাই সঙ্কীর্ণতা। টেবিল চেয়ার না হওয়া পর্যন্ত তাহারা খাইতে পারে না। অথচ আমরা পালঙ্ক বিছানা, মাদুর, এমন কি মাটির উপর বসিয়াও খাইতে পারি। আমাদের জন্য কোন বাধাবিঘ্ন নাই। এখন বলুন, কাহারা বেশী স্বাধীনতা ভোগ করিতেছে?

আধুনিক সামাজিকতা ঃ এখন আধুনিক সামাজিকতার একটি নমুনা দেখুন। একবার আমার ভাইয়ের বাড়ীতে আহার করিতেছিলাম। আমরা সকলেই বিছানায় বসিয়া আহার করিতেছিলাম। জনৈক জেন্টেলম্যানও তথায় ছিলেন। তিনি কোট প্যান্টে আবৃত অবস্থায় তথায় উপস্থিত হইয়া একদিকে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উদ্দেশ্য—হয়তো তাহার জন্য টেবিল চেয়ার আনা হইবে। কিন্তু ভাই সাহেব আমার উপস্থিতির দরুন টেবিল চেয়ারের কোন বন্দোবস্ত করিলেন না। তিনি বহুক্ষণ পর্যন্ত ভিখারীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইহাতে আমি খুবই লজ্জা অনুভব করিলাম। অবশেষে তিনি অনিচ্ছা সহকারে উভয় পা এক দিকে লম্বা করিয়া ধড়াস করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, "মাফ করিবেন, পা লম্বা করিয়া বসা ছাড়া আমার উপায় নাই।" আমি বলিলাম, "মাফ করিবেন, আমি টেবিল চেয়ারে বসিয়া খাইতে অক্ষম।" ভদ্রলোক পা লম্বা করিতে লজ্জা করিতেছিলেন আর আমি টেবিল চেয়ারে বসিয়া খাইতে লজ্জা করিতাম। অতএব, আমার লজ্জা আল্লামা তাফ্তাযানীর লজ্জার ন্যায় এবং ভদ্রলোকের লজ্জা তাইমুরলঙ্গের লজ্জার সদৃশ।

ঘটনা এইরূপ ঃ তাইমুরলঙ্গ দরবারে পা ছড়াইয়া বসিয়াছিল। কারণ, ল্যাংড়া হওয়ার দরুন তাঁহার এক পা সর্বদা সোজা হইয়া থাকিত। তাঁহার সময়ে আল্লামা তাফ্তাযানী খুব বড় আলেম ছিলেন। তাইমুরলঙ্গ তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা করিত যে, দরবারে তাঁহাকে নিজের সঙ্গে সিংহাসনে বসাইত। আল্লামা যখন সর্বপ্রথম দরবারে আহূত হন, তখন তিনিও তাইমুরের দেখাদেখি এক পা ছড়াইয়া সিংহাসনে বসিলেন। ইহাতে তাইমুর বিরক্তি স্বরে বলিল ঃ معذورم دار كه مرا لنگ است "আমার পা ল্যাংড়া। কাজেই আমাকে অপারগ মনে করুন। আমি ইচ্ছাপূর্বক পা ছড়াইয়া বসি নাই।" আল্লামা উত্তরে বলিলেন ঃ معذورم دار كه مرا لنگ است অর্থাৎ, "বাহ্যতঃ বাদশাহের চালচলন পদ্ধতি হইতে নিকৃষ্ট চালচলন অবলম্বন করিতে আমি লজ্জাবোধ করি।" কারণ, ইহাতে অন্যের দৃষ্টিতে এল্মের অবমাননা হইবে। কাজেই আপনিও আমাকে অপারগ মনে করুন।

www.BANGLAKITAB.com

এই উত্তর শুনিয়া তাইমুর চুপ হইয়া গেলেন। আল্লামা এর পর হইতে সর্বদাই পা ছড়াইয়া তাইমুরের দরবারে বসিতেন।

এই কারণে আমিও আগন্তুক ভদ্রলোকের জন্য চেয়ার আনিতে বলি নাই। কারণ, ইহাতে ইসলামী সভ্যতার অবমাননা হইত। আমি ভাবিলাম, ভদ্রলোক আজ আপন সামাজিকতার স্বাদ উপভোগ করিয়া দেখুক যে, ইহাতে কি পরিমাণ বিপদ! ইহাতে কি স্বাধীনতা যে, মানুষ চেয়ার টেবিল ব্যতীত বসিতেই পারে না?

একবার আমি কানপুরের মসজিদে হাদীস শরীফ পড়াইতেছিলাম। ইতিমধ্যে জনৈক পুলিশ ইন্সপেক্টর কোটপ্যান্টে আবৃত হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অদূরে আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। উদ্দেশ্য, আমি উঠিয়া তাহার নিকট গেলে তিনি আমার সহিত আলাপ করিবেন। কিন্তু তাহার জন্য আমি হাদীসের পাঠ বন্ধ করিব কেন? অবশেষে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। খোদার কসম, যে পোশাক পরিধান করিলে চেয়ার না আসা পর্যন্ত অপরাধীর ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হয়, উহা হইতে বেশী কারাবাস আর কি হইতে পারে?

এক্ষেত্রে আমি জায়েয না-জায়েযের কথা বলিতেছি না, ইহা স্বতন্ত্র কথা। আমি বলিতেছি যে, এই সমস্ত লোক বড় গলায় জাতীয় বৈশিষ্ট্যের দাবী করে এবং নিজদিগকে ইসলামের সমর্থক ও খাদেম বলিয়া প্রকাশ করে। অন্যের সামাজিকতা অবলম্বন করার পর তাহাদের এই জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও ইসলামপ্রীতি কোথায় বাকী থাকে? অন্যের সামাজিকতা অবলম্বন করত পরোক্ষভাবে ইসলামী সামাজিকতাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া প্রকাশ করাই কি ইসলাম-প্রীতি? তাছাড়া ইহাতে আরও একটি অনিষ্ট আছে। যে আধুনিক সামাজিকতা আপনি গ্রহণ করেন, উহাতে বহুবিধ সঙ্কীর্ণতা বিদ্যমান। যেমন, একটি করিতে চাহিলে আরও দশটি না করিয়া উপায় নাই। সুতরাং এসব বেড়াজালের ভিতর আপনার প্রিয় রটিত স্বাধীনতা কোথায় অবশিষ্ট থাকে?

আজকাল আমাদের যুবক সম্প্রদায় স্বাধীন মনোভাবের বশবর্তী হইয়া বিবাহ-শাদীতে প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করিতে চায়। আমি ইতিপূর্বেও কোথায়ও বলিয়াছি যে, তাহাদের এই মনোভাবে আমাদের আনন্দিত হওয়ার কিছু নাই। কারণ, তাহারা খোদা ও রাসূলের নিষেধাজ্ঞার প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইগুলি নিষিদ্ধ করিতে চায় না; বরং নিজস্ব আচার অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্যই এইগুলি নিষিদ্ধ করিতে চায়। কুপ্রথা দমন করা তো আলেমদের কর্তব্য। কারণ, তাহাদের ধর্ম হইল: تَرَكْتُ اللَّاتَ وَالْعُزّٰى جَمِيْعًا "লাৎ ও ওয্‌যা ইত্যাদি সকল প্রতিমাকে ত্যাগ করিলাম।" (খোদা ব্যতীত অন্য সবের পন্থা ত্যাগ করিলাম)

সালাম আদান প্রদান এবং কথাবার্তার বেলায়ও তাহারা বিজাতির অনুকরণ করিতে শুরু করিয়াছে। ইহার অর্থ হইল, তাহারা শরীঅতের সামাজিকতাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে। কেহ টুপী খুলিয়া সালাম করে, কেহ ইংরেজী শব্দ দ্বারা সালাম করে, আবার কেহ শুধু আদাব ও তসলীম বলে ইত্যাদি।

অনুমতি চাওয়া: সামাজিকতার কোন কোন অঙ্গ সম্বন্ধে কতক লোক মোটেই অবগত নয় যে, ইহা শরীঅতের আদেশের অন্তর্ভুক্ত কিনা; বরং তাহারা ইহাকে শরীঅত বহির্ভূত ব্যাপার মনে করে। যদি কেহ নিয়ম করিয়া লয় যে, সাক্ষাৎপ্রার্থী ব্যক্তি প্রথমে আগমনের কথা জানাইয়া সাক্ষাতের অনুমতি লইবে, তবে তাহাকে দোষারোপ করা হয় এবং বলা হয় যে, সে ইংরেজের প্রথা চালু করিয়াছে। অথচ অনুমতি চাওয়ার এই বিষয়টি ইসলাম ধর্ম হইতে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা

www.BANGLAKITAB.com

শিক্ষা করিয়াছে। কোরআন ও হাদীসে এই সম্পর্কে নির্দেশ বিদ্যমান আছে। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ এইরূপ করিয়া গিয়াছেন। রাসূলে খোদা (দঃ)-ও ইহা কার্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়াছেন। এক্ষেত্রে বিষয়টির আসল স্বরূপ জানা দরকার। কেননা, আজকালকার যুবক সম্প্রদায় যাহা করে, তাহা ইসলামের অনুসরণের জন্য নহে; বরং উহাতেও তাহারা বিজাতির অনুকরণ করে।

তাই শুনুন, ইসলামে অনুমতি চাওয়ার জন্য কার্ড পাঠাইবার প্রয়োজন নাই এবং প্রত্যেক স্থানেই অনুমতি লইতে হয় না। বাহ্যিক হাবভাবে যদি মনে হয় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নির্জনতায় বসিয়া আছে, যেমন ঘরের দরজা বন্ধ দেখা যায়; দরজায় পর্দা ঝুলানো আছে অথবা ঘরটিই মেয়েলোকের বসবাসের। এমতাবস্থায় সাক্ষাতের পূর্বে অনুমতি লওয়া আবশ্যক। যদি পুরুষদের ঘর হয় এবং দরজা খোলা থাকে, পর্দা ঝুলানো না থাকে অনুমতি চাওয়ার কোন প্রয়োজন নাই। (তবে যদি বাহ্যিক লক্ষণাদি দ্বারা জানা যায় যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঘরে অত্যন্ত জরুরী কাজে লিপ্ত আছে, অন্য কেহ তথায় গেলে কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হইবে, তবে অনুমতি না লইয়া যাওয়া উচিত নহে।) অনুমতি চাওয়ার নিয়ম এই যে, প্রথমে আস্‌সালামু আলাইকুম বলিবে। অতঃপর আপন নাম বলিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, "আমি ভিতরে আসিতে পারি কি?" অনুমতি দিলে যাইবে, নতুবা তিনবার এইরূপ করার পর ফিরিয়া যাইবে।

একবার ছাহাবী হযরত আবু মূসা আশ্‌আরী (রাঃ) হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট গেলেন। তিনি উপরোক্ত নিয়মে তিনবার অনুমতি চাওয়ার পর উত্তর না পাইয়া আপন পথে ফিরিয়া গেলেন। হযরত ওমর (রাঃ) স্বীয় খাদেমকে বলিলেন, "আবু মূসার আওয়ায শুনিয়াছিলাম তাহাকে ডাকিয়া আন।" খাদেম বাহিরে আসিয়া দেখিল তিনি চলিয়া গিয়াছেন। হযরত ওমরকে ইহা জানাইলে তিনি আবার নির্দেশ দিলেন—"যেখানেই পাও, তাহাকে এখানে ডাকিয়া আন।" হযরত আবু মূসা উপস্থিত হইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ফিরিয়া গেলেন কেন?" উত্তর দিলেন, "রাসূলে খোদা (দঃ) আমাদিগকে তিনবার সালাম করার পর উত্তর না আসিলে ফিরিয়া যাইতে বলিয়াছেন।"

এই বিষয়টি হযরত ওমরের জানা ছিল না। তাই তিনি আবু মূসাকে বলিলেন, "ইহা যে রাসূলে খোদা (দঃ)-এরই উক্তি, এ সম্বন্ধে আপনি কোন সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিবেন কি?" এই কথা শুনিয়া হযরত আবু মূসা সাক্ষীর খোঁজে মসজিদে নববীতে চলিয়া গেলেন। তখন আনছারদের এক জমাআত মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। ঘটনা শুনিয়া তাঁহারা বলিলেন, "আমরা সকলেই এ বিষয়ের সাক্ষী। তবে আমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ছোট, আমরা তাহাকেই আপনার সহিত পাঠাইব—যাহাতে হযরত ওমর (রাঃ) বুঝিতে পারেন যে, আনছারদের ছেলেরাও এই বিষয়ে অবগত আছে।" আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) ছিলেন ঐ দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ট। তিনিই সাক্ষ্য দানের নিমিত্ত হাযির হইলেন এবং বলিলেন, বাস্তবিকই হুযূর (দঃ) তিনবার ডাকার পর ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দিয়াছেন।

রাসূলে খোদা (দঃ) উপরোক্ত উক্তিটি নিজেও কার্যে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। একদা তিনি ছা'দ ইবনে ওবাদার বাড়ীতে তশ্‌রীফ লইয়া যান। তিনি তিনবার সালাম করত ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলেন। কিন্তু ছা'দ প্রত্যেকবারই চুপ রহিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল—হুযূর বারবার সালাম করিতেছেন, ইহা সৌভাগ্যের কথা। ইহাতে বেশী পরিমাণে দো'আর বরকত পাওয়া যাইবে। তৃতীয় বারের পর যখন সালাম করিলেন না, তখন ছা'দ ঘর হইতে বাহির হইয়া

www.BANGLAKITAB.com

দেখিলেন যে, তিনি ফিরিয়া যাইতেছেন, দৌড়িয়া হুযূরের খেদমতে আরয করিলেন, "আপনি ফিরিয়া যাইতেছেন কেন? আমি তো বেশী পরিমাণে বরকত লাভের জন্য উত্তর দিতেছিলাম না।" হুযূর (দঃ) বলিলেন, আমি তিনবারের বেশী অনুমতি না চাহিতে আদিষ্ট হইয়াছি। মোটকথা, হুযূর (দঃ) ফিরিয়া গেলেন।

আজকাল কেহ সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জন্য এইরূপ নিয়ম চালু করিলে তাহাকে ফেরআউন, অহঙ্কারী ইত্যাদি মনে করা হইবে। কিন্তু হুযূর (দঃ) ও পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের নিয়ম ইহাই ছিল। তিনবার চাওয়ার পর অনুমতি না পাইলে তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে ফিরিয়া যাইতেন এবং মোটেই দুঃখিত হইতেন না। দেখুন, বিষয়টি কত সহজ। ইহাতে অনেক উপকার নিহিত আছে। অতএব, বুঝা গেল, আমাদের সামাজিকতা সর্বপ্রকারে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পানাহারের ব্যাপারে এবং দেখা সাক্ষাতের ব্যাপারেও। দুঃখের বিষয়, আমরা ইহার মূল্য দেই না এবং বিনা প্রয়োজনে অন্যের দুয়ারে ভিখারীর ন্যায় ধরনা দেই।

ছূফীবাদের স্বরূপঃ ছূফীবাদ ধর্মের পঞ্চম অঙ্গ। পরিতাপের বিষয় আজকাল লোকেরা ইহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছে। অনেকের ধারণা, ছূফীবাদ বড় কঠিন ব্যাপার। ইহাতে পরিবার পরিজন সব ত্যাগ করিতে হয়। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। বন্ধুগণ, খোদার সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি করাই হইল ছূফীবাদের স্বরূপ। ইহাতে না-জায়েয সাংসারিক সম্পর্ক অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। তবে জায়েয ও জরুরী সম্পর্ক ইহা দ্বারা আরও নিবিড় হইয়া যায়। তাই ছূফীগণ বিবি-বাচ্চাদের সহিত যেরূপ সুমধুর সম্পর্ক রাখেন, দুনিয়াদারগণ তদ্রূপ রাখিতে পারে না। অনেকে মনে করে, ছূফীগণ নিষ্ঠুর প্রকৃতির হইয়া থাকেন। অথচ তাঁহারা এতই করুণহৃদয় যে, জন্তুদের প্রতিও করুণা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সংসর্গে থাকিলে জানা যায় যে, তাঁহারা প্রত্যেকের আরামের প্রতি কতটুকু লক্ষ্য রাখেন। অতএব, ইহাকে ভয় করা নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছুই নহে। ফলে ইসলামের একটি আবশ্যকীয় অঙ্গ একেবারেই বাদ পড়িয়া যাইতেছে। এই অঙ্গটির প্রয়োজনীয়তা ও উহা লাভ করা সম্পর্কে কোরআন শরীফে স্থানে স্থানে নির্দেশ রহিয়াছে। আল্লাহ্ পাক বলেনঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ *

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা খোদাকে প্রকৃত ভয় করার ন্যায় ভয় কর।" ইহাতে পূর্ণ তাক্ওয়া (খোদা-ভীতি) অর্জনের নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, ছূফীবাদ বলিতে ইহাই বুঝায়। চাক্ষুষ দেখা গিয়াছে যে, ছূফীগণ ব্যতীত খোদাকে এইরূপ আর কেহ ভয় করিতে পারে না। তাহাদের প্রত্যেকটি কথায় খোদা-ভীতি ফুটিয়া উঠে। নির্ভীকতা ও স্বাধীন চিত্ততার নামগন্ধও তাহাদের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ছূফীবাদ সম্পর্কে হাদীসেও তাকীদ রহিয়াছে। রাসূলে খোদা (দঃ) বলেনঃ

اِنَّ فِىْ جَسَدِ ابْنِ اٰدَمَ مُضْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ اَلَا وَهِىَ الْقَلْبُ

"মানুষের দেহে একটি মাংসপিণ্ড আছে। উহা ঠিক হইলে সমস্ত শরীরই ঠিক হইয়া যায় এবং উহা নষ্ট হইয়া গেলে সমস্ত শরীরই নষ্ট হইয়া যায়। শুনিয়া রাখ, উহা হইল আত্মা।" এই হাদীসে আত্মার সংশোধনের জন্য জোর তাকীদ দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাকেই সংশোধনের কেন্দ্র

www.BANGLAKITAB.com

প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। ইহাই ছূফীবাদের সারকথা। ইহাতে আত্মার সংশোধনের প্রতিই যত্ন নেওয়া হয়।

ইসলামের স্বরূপ ঃ এক হাদীসে বর্ণিত আছে—(ইহা হাদীসে জিব্‌রায়ীল নামে খ্যাত।) একবার হযরত জিব্‌রায়ীল (আঃ) মানবাকৃতি ধারণ করিয়া রাসূলে খোদা (দঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। ছাহাবাদিগকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনি হযরত (দঃ)-কে কয়েকটি প্রশ্ন করেন। তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্ন হইল ঃ

يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلَامِ

"হে মোহাম্মদ! আমাকে ইসলামের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত করুন।"

قَالَ اَلْاِسْلَامُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِىَ الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔

হুযূর বলিলেন ঃ "ইসলামের স্বরূপ হইল এইরূপ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই, মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত রাসূল এবং নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রমযান মাসের রোযা রাখা এবং বায়তুল্লাহ্ পৌঁছিবার সামর্থ্য থাকিলে হজ্জ করা।" জিব্‌রায়ীল (আঃ) আবার প্রশ্ন করিলেন ঃ

اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِيْمَانِ ❋

"আমাকে ঈমানের স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত করুন।"

قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهٖ وَشَرِّهٖ

হুযূর বলিলেন ঃ "ঈমান হইল—আল্লাহ্‌র উপর এবং তাঁহার সমস্ত ফেরেশতা, সমস্ত আসমানী কিতাব, সকল পয়গম্বর, কিয়ামত দিবস এবং তক্‌দীরের ভাল-মন্দের উপর পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা।" (ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রেসালতে বিশ্বাস স্থাপন না করিলে মুসলমান হওয়া যায় না এবং কিয়ামত, তক্‌দীর ও ফেরেশতাদের উপর ঈমান না থাকিলে মু'মিন হওয়া যায় না। কিয়ামত বিশ্বাস করার অর্থ নিজস্ব মনগড়া উপায়ে বিশ্বাস করা নয়; বরং হুযূর (দঃ) যেরূপ বলিয়াছেন, ঠিক ঐরূপে বিশ্বাস করা। সুতরাং হিসাব-কিতাব, আমল ওযন করা, পুলসিরাত ইত্যাদি সব কিছুতেই বিশ্বাস রাখিতে হইবে। হাদীস হইতে ইহাও জানা যায় যে, আমল ইসলামের একটি অঙ্গ বিশেষ। সুতরাং পূর্বোক্ত বর্ণনানুযায়ী যাহারা ধর্মের অঙ্গসমূহে বাছাই করে, তাহাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত হইয়া গেল।)

হযরত জিব্‌রায়ীল (আঃ) পুনর্বার প্রশ্ন করিলেন ঃ قَالَ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِحْسَانِ "আমাকে এহ্‌সান (এখলাছ) সম্বন্ধে জ্ঞাত করুন।"

قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهٗ يَرَاكَ ❋

"রাসূলে খোদা (দঃ) উত্তরে বলিলেন ঃ এহ্‌সানের অর্থ—এরূপভাবে খোদার এবাদত করা যেন আপনি তাহাকে দেখিতেছেন। কেননা, আপনি যদি তাহাকে না-ও দেখেন, তিনি তো আপনাকে নিশ্চয়ই দেখিতেছেন।" (হাদীসের মতলব এই যে, খোদাকে দেখিয়া যেভাবে এবাদত করা উচিত, সেইভাবে কর। চাকর যদি জানে যে, মালিক তাহাকে দেখিতেছে, তবে সে

www.BANGLAKITAB.com

মালিককে না দেখিলেও ঐ রকম কাজ করিবে, যে রকম মালিককে দেখিলে করিত।) ইহাতে বুঝা যায় যে, ইসলাম ও ঈমান পূর্ণরূপে অর্জন করিতে হইলে আরও একটি বিষয় অত্যাবশ্যকীয়। উহাতে পূর্ণরূপে এবাদত পালিত হয়। উহাই এহ্‌সান। বলা বাহুল্য, এই এহ্‌সান অর্জন করাই ছূফীবাদের লক্ষ্য।

আমলের প্রকারভেদ ঃ আমল দুই প্রকার। প্রথমতঃ, বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল। দ্বিতীয়তঃ, অন্তরের আমল। এবাদত, লেন-দেন, সামাজিকতা ইত্যাদি প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। অন্তরের আমলও দুই প্রকার। প্রথমটি আকায়েদ। এই প্রকার আমল শুধু জানিতে ও বিশ্বাস করিতে হয়। দ্বিতীয় প্রকার ঐ সমস্ত আমল, যাহা অন্তরে সৃষ্টি করিতে হয় এবং উহার বিপরীত বিষয়গুলি হইতে অন্তরকে পবিত্র রাখিতে হয়। যথা ঃ এখলাছ, ছবর, শুক্‌র, মহব্বত, খোদা-ভীতি, খোদার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্টি, তাওয়াক্কুল, বিনয়, অল্পে তুষ্টি ইত্যাদি। এইগুলি লাভ করা জরুরী এবং ইহাদের বিপরীত বিষয়গুলি অন্তর হইতে মুছিয়া ফেলাও জরুরী। যথা ঃ রিয়া, অহঙ্কার, ক্রোধ, লোভ, দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ইত্যাদি। মোটকথা, কোন কোন কাজ গ্রহণযোগ্য ও কোন কোন কাজ বর্জনীয়, এইগুলি দ্বারাই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল তথা এবাদত ইত্যাদি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, আর এই সবগুলির পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়ার নামই এহ্‌সান।

এখন কোরআন ও হাদীসে এই সমস্ত আন্তরিক আমলের প্রতি তাকীদ আছে কিনা, তাহাই দেখুন। কোরআনে বলা হইয়াছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝

"ঐ সমস্ত নামাযীদের জন্য অভিশাপ, যাহারা নামাযের বিষয়ে গাফেল এবং যাহারা লোক-দেখান নামায পড়ে।" এই আয়াতে নামাযে রিয়া ও গাফলতি সম্পর্কে কঠোর শাস্তির উল্লেখ রহিয়াছে।

হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبْرٍ *

"যাহার অন্তরে অণু পরিমাণও অহঙ্কার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।" তদ্রূপ কোরআন ও হাদীসের আরও বিভিন্ন স্থানে মন্দ চরিত্রের নিষেধাজ্ঞা ও শাস্তির উল্লেখ এবং উত্তম চরিত্রের তাকীদ ও উহার পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হইয়াছে। অতএব, চরিত্রের এই অঙ্গ অর্জন করা ওয়াজিব প্রমাণিত হইল। বলা বাহুল্য, ইহাই ছূফীবাদের স্বরূপ। কাজেই প্রমাণিত হইল যে, ছূফীবাদ ধর্মের একটি বিশেষ জরুরী অঙ্গ।

তবে প্রত্যেক বিষয়ে কিছু না কিছু আনুষঙ্গিক কাজ এবং উপায় অবলম্বন করিতে হয়। যেমন, হজ্জ করিতে হইলে পথখরচ সঙ্গে লইতে হয়। ইহাতে সহজে গন্তব্যস্থানে পৌঁছা যায়। তদ্রূপ ছূফীবাদের আসল লক্ষ্য আত্ম-সংশোধন হইলেও উহা লাভ করিতে কতিপয় উপায় অবলম্বন করিতে হয়, যদ্দরুন সহজে আসল লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। যেমন, যিকর-আয্‌কার, হাল ইত্যাদি। দুঃখের বিষয়, আজকাল ভুলক্রমে এইগুলিকেই আসল লক্ষ্য বানাইয়া লওয়া হইয়াছে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এইগুলি আনুষঙ্গিক ব্যাপার এবং উপায় মাত্র। আসল লক্ষ্য হইল আত্মার সংশোধন। এই লক্ষ্যেরও একটি লক্ষ্য আছে। তাহা হইল খোদার সন্তুষ্টি লাভ। ইহার প্রত্যক্ষ ফল খোদার নৈকট্য লাভ।

www.BANGLAKITAB.com

মোটকথা, ধর্মকর্মের ধারাবাহিকতা এইরূপ হইবে—প্রথমে আকায়েদ শুদ্ধ করিতে হইবে। তৎপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল তথা, এবাদত, লেন-দেন ও সামাজিকতা শুদ্ধ করিবে। এর পর আত্মার সংশোধনের প্রতি যত্নবান হইবে। কামেল শায়খকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া তাঁহার নির্দেশমত যিকরে মশ্‌গুল হইবে। ইহাতে আত্মসংশোধন সহজে লাভ হয়। কেননা, যিকর-আয্‌কার দ্বারা খোদার সহিত সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। ফলে শীঘ্র শীঘ্র অন্তরে চারিত্রিক যোগ্যতা সৃষ্টি হইয়া যায়। যিকর-আয্‌কার করার সময় চরিত্রের প্রতিও লক্ষ্য দেওয়া উচিত। কেননা, ইহাই মুখ্য বিষয়। কিছু সংখ্যক লোক শুধু যিকরেই লিপ্ত থাকে চরিত্র সংশোধনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না। ইহা অজ্ঞানতা বৈ কিছুই নহে। চরিত্র সংশোধনের উপায় হইল শায়খের সম্মুখে নিজের দোষ-ত্রুটি পরিষ্কার বর্ণনা করিয়া দেওয়া। এর পর শায়খ যে পন্থা বলিয়া দেন, উহার উপর আমল করা, যেরূপ ইমাম গায্‌যালী (রঃ) 'এহ্‌ইয়াউল উলূম' কিতাবে আত্মার প্রত্যেকটি রোগ ও উহার চিকিৎসা, পৃথক পৃথক বর্ণনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, আজকাল কিছু সংখ্যক লোক আত্মার সংশোধনের জন্য মনগড়া উপায় বাহির করিয়াছে। তাহারা শুধু যিকর করিয়াই ক্ষান্ত হইয়া যায়। স্মরণ রাখুন, এইভাবে আত্মার সংশোধন হয় না; বরং পূর্বোল্লিখিত উপায়েই ইহা হাছিল হয়। যেমন, কাহারও মধ্যে অহঙ্কার থাকিলে শায়খের উচিত—যিকর করার সাথে সাথে তাহাকে এমন কাজ করিতে বলা, যাহাতে অন্তরে বিনয় ভাব উৎপন্ন হয়। যেমন, নামাযীদের ওযূর জন্য লোটা ভরিয়া দেওয়া, তাহাদের জুতা সোজা করা ইত্যাদি। শায়খ না বলিলেও মুরীদের স্বেচ্ছায় এরূপ কাজ করা উচিত। যাহাতে অন্তরে বিনয় ভাব সৃষ্টি হয়। তদ্রূপ কাহারও মধ্যে হিংসা-রোগ থাকিলে তাহার উচিত—যাহার প্রতি হিংসা, তাহার প্রশংসা করা। ইহাতে অন্তরের মলিনতা দূর হইয়া যাইবে। এইরূপে প্রত্যেকটি রোগের বিশেষ বিশেষ চিকিৎসা আছে, ছূফীবাদ সম্পর্কিত পুস্তক পাঠ করিলে ইহা জানা যাইবে। মোটকথা, এগুলিই হইল চরিত্র সংশোধনের উপায়।

অতঃপর ইহার ফল অর্থাৎ, খোদার সন্তুষ্টির কথা আসে। আজকাল কিছু লতীফা জারী হওয়া, কিছু রোদন ও ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হওয়া ইত্যাদিকেই ফল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। বন্ধুগণ, এগুলি হাল মাত্র যাহা ক্ষমতা বহির্ভূত। সুতরাং কাম্য হইতে পারে না। যাহা লাভ করা বান্দার ক্ষমতাধীন অর্থাৎ, উত্তম চরিত্র অর্জন করা ও দুশ্চরিত্রতা হইতে বাঁচিয়া থাকা, ইহাই মূল উদ্দেশ্য। 'কাশ্‌ফ' (অদৃশ্য বিষয়কে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা দেখা) কাম্য হওয়া উচিত নহে। উহা লাভ হইয়া গেলে যদি অন্তরে অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতা দেখা না দেয়, তবে উহার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আর লাভ না হইলে তজ্জন্য তৎপর না হওয়া উচিত। এমতাবস্থায় বুঝা উচিত যে, কাশ্‌ফ না হওয়াই তাহার সাফল্যের উপায় বিবেচিত হইয়াছে। কারণ, মাঝে মাঝে কাশ্‌ফের ফলে মানুষ নানাবিধ বিপদে পতিত হইয়া পড়ে। মোটকথা, আপনি নিজের জন্য কোন পথ বাছিয়া লইবেন না।

بدرد و صاف ترا حکم نیست دم در کش ـ که آنچه ساقی ما ریخت عین الطاف است

(বদ্‌রদ্ ও ছাফ তোরা হুকুম নীস্ত দম দরকাশ
কেহ্ আঁচে সাকীয়ে মা রীখ্‌ত আইনে আল্‌তাফ আস্ত)

"সঙ্কোচ ও খোলাখুলি ভাবে চাওয়া না চাওয়ার অধিকারী তুমি নও। খোদা তোমাকে যাহাই দেন, আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের পক্ষে উহাই মঙ্গলজনক ও সাক্ষাৎ মেহেরবানী।" আরও বলেন ঃ

www.BANGLAKITAB.com

تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد مکن ـ که خواجـه خود روش بنده پروری داند

(তু বন্দেগী চু গাদায়াঁ বশর্‌তে মুয্‌দ মকুন + কেহ খাজা খোদ রভিশে বন্দা পরওয়ারী দানাদ)

"তুমি মজুরের ন্যায় পারিশ্রমিকের শর্তে খোদার বন্দেগী করিও না। কেননা, প্রভু দাস পালনের রীতিনীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞাত আছেন।"

হাল ইত্যাদি লক্ষ্য বস্তু মনে করিয়া লওয়াই সকল ব্যাকুলতা ও দুশ্চিন্তার মূল কারণ। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এগুলি উপায় ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে গণ্য। এগুলি প্রত্যেকের মধ্যেই বিভিন্নরূপে দেখা দিতে পারে। মোটকথা, উল্লিখিত পাঁচটি অঙ্গ লাভ করাই ধর্মের সারকথা। এইগুলিকেই সংক্ষিপ্তভাবে আল্লাহ্ তা'আলা এই আয়াতে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا ۝

উপরোক্ত পাঁচটি অঙ্গ কার্যে পরিণত করিলে আপনি اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ -এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবেন। অতঃপর ইহার ফল লাভ হইবে। অর্থাৎ, আপনি আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয় হইয়া যাইবেন। পূর্বে ইহার ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে করা হইয়াছে।

অদ্যকার ওয়াযের আলোচ্য বিষয় ছিল শুধু ইহার উপায় বর্ণনা করা। খোদার ফযলে ইহা প্রয়োজনানুযায়ী বর্ণিত হইয়া গিয়াছে। এখন আমল করা আপনাদের কাজ। আসুন, দো'আ করি—হক তা'আলা আমাদের সকলকে সুস্থ জ্ঞান-বুদ্ধি ও আমল করার সাহস দান করুন। আমীন!

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِعِزَّتِهٖ وَجَلَالِهٖ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ۝

—■—

www.BANGLAKITAB.com

পূর্ণ ধার্মিকতা

■

পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জনের আবশ্যকতা ও উহার উপায় সম্বন্ধে দিল্লীর বল্লীমাঁরা মহল্লায় পাঞ্জাবীদের মসজিদে ২৫শে যিলহজ্জ ১৩৪০ হিজরী রবিবার সকাল ৭—৫ মিনিট হইতে সোয়া এগারটা পর্যন্ত দণ্ডায়মান অবস্থায় ওয়ায করেন। শ্রোতাদের সংখ্যা ছিল প্রায় তিন হাজার। হযরত মাওলানা যফর আহ্‌মদ ওসমানী থানভী সাহেব ইহা লিপিবদ্ধ করেন।

খোদা পর্যন্ত পৌঁছিবার সহজতম পথ এই যে, অসম্পূর্ণ অবস্থার উপর সন্তুষ্ট না হইয়া পূর্ণ ধার্মিকতা অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। উহার উপায় হইল আমলে পূর্ণতা অর্জন করা, ফরয ও ওয়াজিব পালনে ত্রুটি না করা, হারাম কার্যাদি হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং আমল কামেল করার সময় নফসে যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়, কামেল ব্যক্তিদের সংসর্গে থাকিয়া উহার প্রতিকার করা।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ ـ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ قَالَ اللهُ تَعَالٰى يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ *

আয়াতের অর্থঃ 'হে ঈমানদারগণ! খোদাকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গী হইয়া যাও।'

ভূমিকা

ইহা একখানি সংক্ষিপ্ত আয়াত। ইহাতে আল্লাহ্ তা'আলা একটি উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া তৎসঙ্গে উহা লাভ করার উপায় নির্ধারণ করিয়াছেন। আয়াতে বর্ণিত উপায়টি যে অত্যন্ত সহজ, আমি পরে তাহা প্রমাণ করিব। ইহা জানা কথা যে, প্রত্যেকেরই একটা না একটা উদ্দেশ্য ও উহা অর্জন করার উপায় রহিয়াছে। এই উপায় কখনও সহজ, কখনও কঠিন হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট ও তাহার উপায় জানা থাকিলে এবং উপায়টি সহজ হইলে সত্বর কৃতকার্য হওয়া যায়।

www.BANGLAKITAB.com

বলা বাহুল্য, অকৃতকার্যতার একমাত্র কারণ হইল উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট না হওয়া অথবা নির্ভুল উপায় অবগত না থাকা কিংবা উপায় এত কঠিন হওয়া যে, উহা লাভ করিতে মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়ে।

অকৃতকার্যতার রহস্য ঃ উদাহরণতঃ রুগ্ন ব্যক্তির অকৃতকার্যতার কয়েকটি কারণ থাকিতে পারে। প্রথমতঃ, সুস্থতা যে একটি লক্ষ্যবস্তু, তাহা সে জানে না। কাজেই স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সে কখনও সচেষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ইহা জানা থাকিলেও সুস্থতা লাভ করিবার উপায় চিকিৎসা কিনা, তাহা জানে না। তৃতীয়তঃ, ইহাও জানা থাকিলে চিকিৎসা পদ্ধতিতে ভুল করিয়া বসে। আবার এমনও হয় যে, লক্ষ্যবস্তু জ্ঞাত, উপায়ও জ্ঞাত, নির্ভুল পদ্ধতিও জ্ঞাত, কিন্তু সাহসের অভাব। যেমন, সুস্থতা যে কাম্যবস্তু তাহা জানা আছে। ইহার উপায় যে চিকিৎসা তাহাও অজানা নহে এবং চিকিৎসকও খুব দক্ষ বলিয়া জানা আছে, কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, চিকিৎসক একশত টাকার একটি ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিয়াছে। অথচ সে এত টাকা মূল্যের ঔষধ কিনিতে সক্ষম নহে। উপরোক্ত বিষয়গুলিই যাবতীয় পার্থিব ব্যাপারে অকৃতকার্যতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

উদাহরণতঃ, জীবিকা উপার্জন যে একটি লক্ষ্যবস্তু, এই ব্যক্তি তাহা মোটেই জানে না। ফলে সে সর্বদা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে। কিংবা ইহা জানিলেও উহার উপায় জানে না। বলা বাহুল্য, এই উভয় ব্যক্তিই অনাহারে মরিবে অথবা কেহ উপায় জানে, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবেরা ব্যবসা করার পরামর্শ দিল। কারণ, তাহারা ইহাতে যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে। এখন জানা কথা যে, ব্যবসার জন্য টাকা-পয়সা দরকার। অথচ এই ব্যক্তি কখনও টাকা-পয়সার মুখও দেখে নাই। সুতরাং এই ব্যক্তিও অনাহারে মরিবে। কেননা, বন্ধুরা তাহাকে এমন এক উপায় বলিয়াছে, যাহা তাহার সামর্থ্যের বাহিরে। কেহ দয়া করিয়া তাহাকে মজুরীর উপায় বলে নাই। ইহাতে শুধু হাত-পা কাজে লাগাইতে হয়, টাকা-পয়সার দরকার হয় না। এইরূপে প্রত্যেক কাজেই চিন্তা করিলে অকৃতকার্যতার রহস্য জানা যাইবে।

আকাঙ্ক্ষা ও উপায়ের পার্থক্য ঃ লক্ষ্য এবং উপায় নির্দিষ্ট ও সহজ হওয়ার পরও যদি কেহ অকৃতকার্য থাকে, তবে ইহার একমাত্র কারণ হইবে অলসতা। এই ব্যক্তি শুধু আকাঙ্ক্ষা করাকেই উদ্দেশ্য হাছিলের উপায় মনে করে। ইহা মারাত্মক ভুল। শুধু আকাঙ্ক্ষা কোন কিছু লাভ করার উপায় হইতে পারে না। মনে করুন, এক ব্যক্তি ঘরে শস্য সঞ্চিত করিতে চায়; কিন্তু তজ্জন্য চাষবাস, বীজ বপন ইত্যাদি কিছুই করে না। এমতাবস্থায় সে শত আকাঙ্ক্ষা করিলেও তাহার ঘরে শস্য সঞ্চিত হইতে পারে না। কারণ, শুধু আকাঙ্ক্ষা করিলে শস্যে ঘর ভরিয়া যাইবে—খোদার রীতি তাহা নহে। হাঁ, খোদা আপন ক্ষমতা প্রদর্শনার্থে কোন কোন ক্ষেত্রে এরূপ করিয়া দিলে তাহা নিতান্তই বিরল ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইবে। বিরল না থাকারই শামিল। কোনরূপ উপার্জন ব্যতিরেকে শস্যে ঘর ভরিয়া দেওয়া খোদার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত নিশ্চয়। কোন কোন সময় এরূপ ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে, কেহ কেহ অভাবিত উপায়ে বিরাট ধনভাণ্ডার প্রাপ্ত হইয়া এক দিনেই বিত্তশালী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু খোদা এরূপ করার কোন ওয়াদা দেন নাই। সুতরাং খোদার রীতি ও ওয়াদা না থাকা সত্ত্বে কোন্ ভরসায় হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া থাকা যাইবে?

উদাহরণতঃ, খোদা আপন ক্ষমতা প্রদর্শনার্থে হযরত মরইয়মকে, পিতা ব্যতীতই একটি পুত্র-সন্তান দান করিয়াছিলেন। অথচ পিতা ব্যতীত সন্তান না হওয়াই খোদার চিরন্তন রীতি। এখন যদি কোন মহিলা বিবাহ ছাড়াই মরইয়মের ন্যায় বিনা বাপে সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা করে,

www.BANGLAKITAB.com

তবে সকলেই তাহাকে পাগল আখ্যা দিবে। এক্ষেত্রে মনে করা হইবে যে, মহিলাটি আসলে সন্তানই কামনা করে না। করিলে সে অবশ্যই বিবাহ করিত।

তদ্রূপ, হক তা'আলা আদম (আঃ) কে পিতা-মাতা ছাড়াই পয়দা করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন পুরুষ যদি মনে করে যে, বিবাহ ও স্ত্রীসঙ্গম ব্যতিরেকেই তাহারও একটি পুতুলের ন্যায় মাটি নির্মিত সন্তান পয়দা হউক, তবে সকলেই তাহাকে বোকা বলিবে এবং মনে করিবে যে, সে সন্তান চায় না। চাহিলে অবশ্যই বিবাহ করিত।

মোটকথা, পার্থিব কাজকর্মে উপায় অবলম্বন করা জ্ঞানী মাত্রই জরুরী মনে করেন এবং কেবল আকাঙ্ক্ষাকেই যথেষ্ট মনে করেন না; বরং উপায়হীন আকাঙ্ক্ষাকে সকলেই নির্বুদ্ধিতা মনে করে। অথচ উপায় অবলম্বন করিলেও উদ্দেশ্য হাছিল হওয়া নিশ্চিতও নহে। অনেকে ব্যবসা-বাণিজ্য করে, কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেকে চাকুরী করে, কিন্তু বেতন পায় না। কেহ কেহ মজুরী করিয়াও পারিশ্রমিক পায় না। অনেকে শিল্প কাজ জানে, কিন্তু তাহা কোন কাজে লাগাইতে পারে না। তবে শুধু আশার উপর ভিত্তি করিয়া জ্ঞানিগণ এসব উপায় অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তায় একমত হইয়াছেন।

ধর্মে সঙ্কীর্ণতা নাইঃ অতি আশ্চর্যের বিষয়! ধর্মীয় ব্যাপারাদিতে উপরোক্ত নিয়মের অনুসরণ করা হয় না। অথচ ধর্মকাজ সবকিছুই হইতে উত্তম লক্ষ্যবস্তু। কেননা, দুনিয়া অপেক্ষা দ্বীন অগ্রগণ্য বলিয়াই মুসলমানের বিশ্বাস। ধর্মের উপায়ও নির্দিষ্ট এবং জ্ঞাত আছে। তাছাড়া এই সব উপায় যে নির্ভুল, তাহাও অজানা নহে। কারণ, খোদা ও রাসূলের উক্তিকে সত্য জ্ঞান করা মুসলমানের বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত। এই সব উপায় কঠিনও নহে। তবে ইচ্ছারও প্রয়োজন নাই এই অর্থে সহজ নহে; বরং ধর্মীয় উপায়সমূহে পরিশ্রম ও জটিলতার কিছুই নাই। ইচ্ছার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। আমার এই দাবীর স্বপক্ষে সবচেয়ে বড় প্রমাণ আল্লাহ্‌র উক্তি مَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ "খোদা তোমাদের ধর্মীয় কাজে মোটেই সঙ্কীর্ণতা রাখেন নাই।" অপর এক আয়াতে বলেনঃ يُرِيْدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "খোদা তোমাদের কাজ সহজ করিতে চান, তোমাদিগকে কোনরূপ ক্লেশে ফেলিতে চান না।"

কোরআনের উপর মুসলমানদের ঈমান আছে। কাজেই এই দাবী প্রমাণ করার জন্য এতটুকু বলিয়া দেওয়াই যথেষ্ট যে, ধর্মে সঙ্কীর্ণতা নাই বলিয়া হক তা'আলা নিজেই কোরআনে ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু আমি এতটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হইব না; বরং আরও অগ্রসর হইয়া বলিব যে, এই দাবীটি যুক্তিসঙ্গত বটে। কারণ, যখন কোরআন অবতীর্ণ হয়, তখন সমস্ত কাফের ইহার বিরোধিতায় দৃঢ়সঙ্কল্প এবং ইহার দোষ অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিল। তাহারা কোরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য নানাবিধ বাহানা খুঁজিতেছিল। অপরপক্ষে কোরআন বিশ্ববাসীকে আহ্বান জানাইয়া বলিল যে, কাহারও সামর্থ্য থাকিলে কোরআনের ন্যায় একটি কিতাব রচনা করিয়া আনুক। ইহাতে কাফেররা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠে। এর পর হইতে আজ পর্যন্ত প্রতি যুগেই ধর্মদ্রোহীদল কোরআন সম্পর্কে নানাবিধ আপত্তি উত্থাপনের আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় ধর্মে সঙ্কীর্ণতা নাই বলিয়া কোরআন যে জোর দাবী জানাইয়াছে, ইহাতে সামান্যও দুর্বলতা বা ইহা অমূলক হওয়ার সামান্যতম আভাস থাকিলে ধর্মদ্রোহীদল ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া কোরআনের প্রতি আপত্তি উত্থাপন করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিত না। তাহারা উঠিয়া পড়িয়া এই দাবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিত এবং বিরোধিতার জন্য একটি উত্তম বাহানা পাইয়া বসিত যে,

www.BANGLAKITAB.com

দেখুন কোরআনের দাবী কতখানি বাস্তব-বিরোধী। এত কঠিন ধর্মকে সহজ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন বিধর্মী ও বিরুদ্ধাচারী এই দাবীর অসারতা প্রমাণ করিতে পারে নাই। অন্যথায় অন্যান্য উত্থাপিত সমালোচনার ন্যায় ইহাও বর্ণিত হইত। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বিরোধীদল এ ব্যাপারে আপত্তি করার জন্য এতটুকুও সুযোগ পায় নাই।

আধুনিক যুগের আপত্তিসমূহঃ পরিতাপের বিষয়, আজকাল কোরআনে বিশ্বাসী কতক মুসলমান উপরোক্ত দাবী সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করে। অথচ বিরুদ্ধবাদিগণও এ ব্যাপারে সমালোচনার সুযোগ পায় নাই। আমি এই কথা বলি না যে, তাহারা এই দাবীর প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে না। বিশ্বাস করে, তবে কোরআনের এই দাবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার চেষ্টা না করিলেও মন খুলিয়া ইহাকে সমর্থনও করে না। সমর্থন করিতে যাইয়া তাহাদের অন্তর বাধাপ্রাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, বিরুদ্ধবাদিগণ কর্তৃক যে দাবী স্বীকৃত হইয়া গিয়াছে, মুসলমানদের তরফ হইতে উহাতে আপত্তি উত্থাপন করা যারপরনাই লজ্জাকর ব্যাপার।

বন্ধুগণ, আমি কসম করিয়া বলি যে, কোরআনের এই দাবী ষোল আনা সত্য ও নির্ভুল। ইহাতে সামান্যও দুর্বলতা থাকিলে ধর্মদ্রোহীরা তাহা লইয়া হৈ চৈ করিতে দ্বিধা করিত না। আজকাল দুর্বল বিশ্বাসী মুসলমানদের তরফ হইতে এই দাবীর বিপক্ষে এইরূপ যুক্তি বর্ণনা করা হয়ঃ ভাই, ধর্মের উপর আমল করা কঠিন ব্যাপার। ব্যবসা করিতে গেলে পদে পদে শরীঅতের ফতওয়ার সম্মুখীন হইতে হয়। এইরূপে কারবার করিলে ইহাতে সুদ হইবে। এইভাবে করিলে মূল্য অজ্ঞাত থাকে, কাজেই ইহা না-জায়েয, এইভাবে করিলে ত্রুটিযুক্ত শর্ত শামিল হইয়া যায় ইত্যাদি। ইউরোপে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ইউরোপীয়ানদের সহিত ব্যবসা করিতে হয়। তাহারা এসব ব্যাপারে উন্মুক্ত মনোভাবের অধিকারী। ফলে তাহাদের অনেক নিয়ম কানূন শরীঅতের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। এমতাবস্থায় ব্যবসা করিলে ধর্ম ঠিক রাখা যায় কিরূপে? আবার ধর্ম ঠিক রাখিলে ব্যবসা সিকায় উঠিতে বাধ্য। সুদ ব্যতীত কোথাও ঋণ পাওয়া যায় না। অথচ ঋণ না করিলে ব্যবসা চলিতে পারে না। এই উভয় সঙ্কটের অবস্থায় মানুষ কি করিবে?

চাকুরীক্ষেত্রেও শরীঅতের বিরুদ্ধে অনেক কাজ করিতে হয়। কৃষিকাজেও পদে পদে শরীঅতের নির্দেশাবলী বাধা সৃষ্টি করে। আমি এই ওয়াযে উপরোক্ত যাবতীয় আপত্তিসমূহের উত্তর দিতে প্রয়াস পাইব। ইহা ছাড়া আরও কোন আপত্তি কাহারও খেয়ালে থাকিলে আমার বর্ণিত উত্তরে উহারও সমাধান পাওয়া যাইবে।

কতিপয় উদাহরণঃ তবে আমি উত্তর দানের পূর্বে একটি উদাহরণ পেশ করিতেছি। গল্পটি যদিও নোংরা, তথাপি অবস্থার সহিত চমৎকার খাপ খায়। আমাদের মহল্লায় জনৈকা মহিলা মাগরেবের সময় বাচ্চাকে পায়খানা করাইতেছিল। সেদিন ছিল ঈদের চন্দ্রোদয়ের তারিখ। আবালবৃদ্ধবণিতা ঈদের চাঁদ দেখিতেছিল। মহিলাটিও বাচ্চার পায়খানা মুছিয়া চাঁদ দেখিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি মুছিবার কারণে অজ্ঞাতেই তাহার হাতে সামান্য পায়খানা লাগিয়া গিয়াছিল। সে মহিলাদের প্রথা অনুযায়ী নাকে অঙ্গুলি রাখিয়া দেখিতেছিল। ফলে নাকে পায়খানার দুর্গন্ধ অনুভূত হইল। ইহাতে সে নাক সিটকাইয়া বলিতে লাগিল, "উহু, এবারকার ঈদের চাঁদ পচা কেন?" বন্ধুগণ, এই মহিলাটির অঙ্গুলির পায়খানা যেমন চাঁদের গায়ে অনুভূত হইয়াছিল, ফলে সে চাঁদকে পচা মনে করিয়াছিল। খোদার কসম, তদ্রূপ আপনারাও ধর্মের মধ্যে সঙ্কীর্ণতা দেখিতেছেন। আসলে এই সঙ্কীর্ণতা আপনাদের মধ্যেই নিহিত আছে, ধর্মের মধ্যে নহে।

www.BANGLAKITAB.com

আপনাদের তমদ্দুন (কৃষ্টি) ও জীবনযাপন পদ্ধতিই সঙ্কীর্ণতাপূর্ণ। আমি পরে ইহা বিস্তারিত বর্ণনা করিব। আপনি নিজের অঙ্গুলি কখনও দেখেন না যে, উহাতে নাপাকী লাগিয়া রহিয়াছে। অনর্থক শরীঅতের চাঁদকে দুর্গন্ধযুক্ত আখ্যা দেন। অথচ শরীঅতের চাঁদ এত উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন যে, এই সমস্ত আবর্জনা উহার ধারেকাছেও পৌঁছিতে পারে না।

জনৈক নিগ্রোর একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ আছে। সে একবার পথিমধ্যে একটি আয়না পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া উহা কুড়াইয়া লয় এবং উহাতে আপন চেহারা দেখিতে থাকে। সে আয়নার ভিতরে একটি ভয়াবহ কুৎসিত চেহারা প্রতিফলিত হইতে দেখিল। ইহাতে সে মনে করিল যে, চেহারাটি পূর্ব হইতেই আয়নার মধ্যে বিদ্যমান আছে। চেহারাটি যে তাহারই, নিজের সম্বন্ধে এইরূপ কু-ধারণা করিতে সে প্রস্তুত ছিল না। মানুষ স্বীয় চেহারা দেখিতে পায় না বলিয়া উহার ভাল-মন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকে। নিগ্রো ব্যক্তি চেহারা দেখার পর আয়নাটি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এমন কদাকার চেহারাবিশিষ্ট ছিলে বলিয়াই তো তোকে কেহ এখানে ফেলিয়া গিয়াছে।"

বন্ধুগণ! ঠিক তেমনি আপনার কুৎসিত চেহারা ধর্মের আয়নায় দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু আপনি মনে করেন যে, কদর্যতা (নাঊযুবিল্লাহ্) ধর্মের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। অথচ ধর্ম এত পরিষ্কার ও জ্যোতির্ময় যে, অন্ধকার ও কালিমা উহার কাছেও ঘেষিতে পারে না। তবে স্বচ্ছ হওয়ার কারণে আপনার চেহারা উহাতে প্রতিফলিত হয়। আপনি উহাকে ধর্মেরই চেহারা মনে করিয়া বসেন। মাওলানা রূমী ইহার নযীর হিসাবে একটি গল্প বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেনঃ

حمله بر خود میکنی اے ساده مرد — هم چوں آں شیرےکه بر خود حمله کرد

"হে সরল প্রাণ ব্যক্তি, তুমি সিংহের ন্যায় নিজকেই আক্রমণ করিতেছ।"

মাওলানা মসনবী শরীফে এই গল্পটি নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। একদা বন্য পশুরা পরামর্শ সভা ডাকিয়া আলোচনা করিল যে, সিংহ প্রত্যহ আমাদিগকে অতিষ্ঠ করে এবং দুই একটি পশু ধরিয়া লইয়া যায়। ফলে প্রাণ নাশের আশঙ্কায় প্রত্যেকের জীবন তিক্ত ও বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আস আমরা সকলে যাইয়া সিংহকে বলি, সে যেন এইভাবে আমাদিগকে বিরক্ত না করে। তাহার আহারের জন্য আমরা প্রত্যহ একটি করিয়া পশু পাঠাইয়া দিব। ইহাতে অন্যান্য সকল পশু নিশ্চিন্তে দিন অতিবাহিত করিতে পারিবে। সিংহকে এই সিদ্ধান্তের কথা জানাইলে সে সানন্দে সম্মতি জানাইল। কারণ, ইহাতে তাহারও যথেষ্ট আরাম ছিল। বিনা কায়-ক্লেশে ঘরে বসিয়া নিত্যকার খোরাক পাইবে। ইহার পর হইতে বন্য পশুরা প্রত্যহ লটারীযোগে একটি পশু নির্দিষ্ট করিত। লটারীতে যাহার নাম বাহির হইত, সকলে জোর জবর করিয়া তাহাকে সিংহের দরবারে পাঠাইয়া দিত।

ঘটনাক্রমে একদিন খরগোশের পালা আসিল। সকলে বলিল, যাও, আজ তুমিই সিংহের খাদ্য। খরগোশ বলিল, আমি যাইব না। স্বেচ্ছায় মৃত্যুর মুখে পা বাড়ানো বুদ্ধিমানের কাজ নহে; ইহা আত্মহত্যারই শামিল। সকলে বলিল, এখন এই ধরনের কথা বলা উচিত নহে। ইহাতে সিংহের সহিত কৃত চুক্তি ভঙ্গ হইবে। খরগোশ বলিল, যে চুক্তির ফলস্বরূপ আত্মহত্যা করিতে হয়, তাহা স্বয়ং অবৈধ। সুতরাং অবৈধ চুক্তি পালন করা জরুরী নহে। খরগোশের এই যুক্তি শুনিয়া বন্য পশুদের মধ্যে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সকলে একত্রিত হইয়া খরগোশকে বুঝাইতে লাগিল যে,

www.BANGLAKITAB.com

সে না গেলে পশুরাজ সিংহ যারপরনাই রাগান্বিত হইবেন। খরগোশ বলিল, সিংহ রাগান্বিত হইলে সকলের প্রতিই হইবে। ইহাতে যাহার মৃত্যু আসন্ন হইবে, সিংহ তাহাকেই খাইয়া ফেলিবে। তখন আমি হয়তো বাঁচিয়া যাইব। অপর পক্ষে তোমাদের কথামত কাজ করিলে আমার মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে চলিয়া যাওয়া অপেক্ষা অনিশ্চিত মৃত্যুর পর্যায়ে অবস্থান করাই যুক্তিসঙ্গত। পশুরা বলিল, সিংহের সহিত চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার ফলে আমাদের রাজ্যে বিরাট অশান্তি দেখা দিবে। খরগোশ বলিল, আমার অশান্তি তো এখনই শুরু হইয়া গিয়াছে। অশান্তিকে আমি ভয় করি না। মৃত্যু অপেক্ষা বড় কোন অশান্তি নাই। বড় জোর রাগান্বিত হইয়া আমাকে গিলিয়া ফেলিবে। তোমরা তো আমাকে এরূপ করিতেই বলিতেছ। তাছাড়া অশান্তির সময় আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে পারিব। এর পরও মারা গেলে তাহা অদৃষ্টের পরিহাস হইবে। তবুও ইহা তোমাদের প্রস্তাব হইতে অনেক সহজ। কারণ, ইহাতে আত্মহত্যার পাপ হইবে না।

বন্য পশুরা দেখিল, যুক্তিতর্কে খরগোশ কাবু হইবে না। এবার তাহারা সামাজিক চাপ প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত করিল। তাহারা বলিল, না, তোমাকে যাইতেই হইবে। স্বেচ্ছায় না গেলে জবরদস্তি তোমাকে সিংহের হাতে সোপর্দ করিয়া দিব। অবশেষে সামাজিক চাপে বাধ্য হইয়া খরগোশ পথ ধরিল। কিন্তু কি কৌশলে প্রাণ বাঁচানো যায় এবং সমাজের পশুরাও সন্তুষ্ট থাকে সারাটি পথ শুধু সে এই চিন্তায়ই মশগুল রহিল। পথিমধ্যে সে একটি কূপ দেখিতে পাইয়া খুবই আনন্দিত হইল। সে মনে মনে স্থির করিল যে, এই কূপেই পশুরাজ সিংহকে ডুবাইয়া মারিতে হইবে। এর পর সে দ্রুতগতিতে সিংহের দরবারের দিকে পা বাড়াইল।

নির্ধারিত খাদ্য পৌঁছিতে বিলম্ব হওয়ায় এদিকে সিংহের অস্থিরতা দেখে কে। সে ভাবিতেছিল, মনে হয় বন্য পশুরা চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে। অদ্য যাইয়া তাহাদিগকে সমুচিত শাস্তি দিতে হইবে। খরগোশকে দেখিয়াই সিংহ তর্জন গর্জন সহকারে গালিগালাজ আরম্ভ করিয়া দিল—কি হে, অপদার্থ! আজ এত দেরী হইল কেন? মনে হয়, তোরা চুক্তি ভঙ্গের ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়াছিস্।

খরগোশ বলিল, হুযূর! প্রথমে অধমের ঘটনাটি শ্রবণ করুন। এর পর তর্জন গর্জন করুন। অদ্য দেরী হওয়ার কারণ এই যে, আপনার রাজ্যে প্রবল পরাক্রমশালী একটি শত্রু অনুপ্রবেশ করিয়াছে। সে আমার রাস্তা আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে বলে, তোমরা অমুক সিংহের পরিবর্তে আমাকে ভোগ দাও। অদ্য আপনার খোরাকের জন্য একটি মোটা তাজা খরগোশ নির্বাচন করা হইয়াছিল। সে আমার সহিত এক সঙ্গে আসিতেছিল। আপনার শত্রু উহাকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। আমি কোন মতে প্রাণ লইয়া আপনাকে খবর দিতে আসিয়াছি। যদি আপন ভোগ নিরাপদ রাখিতে চান, তবে অদ্যই এই শত্রুকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করুন। নতুবা জানিয়া রাখুন, আগামীকল্য হইতে আপনার ভোগ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। সে কিছুতেই এই পর্যন্ত পৌঁছিতে দিবে না।

প্রতিদ্বন্দ্বীর উপস্থিতির কথা জানিয়া পশুরাজ সিংহ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িল। সে খরগোশকে বলিল, আমার সাথে চল, আমি এখনই তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিব। আমা হইতে শক্তিশালী সিংহ কে? তাহার সহিত বুঝাপড়া না করিয়া ছাড়িব না। খরগোশ তাহাকে লইয়া কূপের ধারে পৌঁছিয়া বলিল, হুযূর! হতভাগা এই কূপের মধ্যেই লুকাইয়া আছে। দেখিবেন, তাহার নিকট আমা হইতে মোটা খরগোশটিও রহিয়াছে। সিংহ কূপের মধ্যে উঁকি দিতেই উহাতে তাহার প্রতিচ্ছায়া দৃষ্টিগোচর হইল। খরগোশও তাহার সহিত উঁকি দিয়াছিল। ফলে একটি খরগোশও দেখা গেল।

www.BANGLAKITAB.com

পানির নীচে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া আসল বস্তু হইতে বড় দেখা যায়। ইহাই নিয়ম। ফলে সিংহের সহিত খরগোশের আকৃতিটিও বড় দেখা গেল। সিংহ রাগে গরগর করিতে করিতে আপন প্রতিচ্ছবিকেই আক্রমণ করিয়া বসিল। সে ধড়াস করিয়া নীচে পড়িয়া গেল, তথায় পানি ব্যতীত আর কি থাকিবে? খরগোশ উপর হইতে গলা বাড়াইয়া বলিল, বাচাধন, ইহাই তোমার জেলখানা। ইহাতেই ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জন দাও। আমি বাড়ী চলিলাম। 'সালাম লও' বলিয়া খরগোশ আনন্দচিত্তে আপন সমাজে পৌঁছিয়া গেল। অন্যান্য পশুরা বলিল, কি হে, তুই সিংহের নিকট যাস নাই? খরগোশ বলিল, গিয়াছিলাম বৈ কি, তোমরা আমাকে সিংহের শিকার বানাইতে চাহিয়াছিলে, এখন আমিই তাহাকে শিকার করিয়া চলিয়া আসিলাম। এই গল্প বর্ণনা করার পর মাওলানা রূমী বলেনঃ

حملہ بر خود میکنی اے سادہ مرد۔ ہم چوں آں شیرےکہ بر خود حملہ کرد

'হে সরল প্রাণ ব্যক্তি! সিংহটি যেরূপ নিজেকে আক্রমণ করিয়াছিল, তদ্রূপ তুমিও নিজেকে আক্রমণ করিতেছ।'

সঙ্কীর্ণতার স্বরূপঃ বন্ধুগণ! আপত্তি উত্থাপনকারীদের অবস্থাও তদ্রূপ। তাহারা শরীঅত সম্বন্ধে যেসব আপত্তি করে, তাহা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের সম্বন্ধেই করিতেছে। তবে তাহারা টের পাইতেছে না। এক্ষেত্রে আপনি হয়তো বলিবেন যে, ইহা তো একটি দাবী। ইহার প্রমাণ কি? আমরা শরীঅতের চাক্ষুষ সঙ্কীর্ণতা দেখিতেছি। যে কোন লেন-দেনের ব্যাপারে শরীঅতের নির্দেশের উপর আমল করিলে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়।

ইহার উত্তর এই যে, আমি লেন-দেনে অসুবিধা দেখা দেওয়াকে অস্বীকার করি না, তবে দেখিতে হইবে যে, এই অসুবিধার কারণ কি শরীঅত, না আপনার ত্রুটিপূর্ণ জীবনযাপন পদ্ধতি? মনে রাখিবেন, কোন আইনকে তখনই সঙ্কীর্ণ বলা যায়, যখন সকলেই উহার উপর আমল করিতে চায়; কিন্তু তাহা খুবই অসুবিধাজনক হইয়া দাঁড়ায়। কোন আইনের উপর এক হাজারের মধ্য হইতে দশজনে আমল করিতে চাহিলে এবং অবশিষ্ট সকলেই ইহার খেলাফ আমল করিলে উহাকে সঙ্কীর্ণ আইন আখ্যা দেওয়া যায় না। এক্ষেত্রে বলা হইবে যে, তাহাদের তমদ্দুন তথা জীবন-ব্যবস্থাই সঙ্কীর্ণ।

এই নীতি উপলব্ধি করার পর চিন্তা করুন—শরীঅতের উপর আমল করিলে অসুবিধা দেখা দেয় কেন? ইহার একমাত্র কারণ হইল, আপনি একা উহার উপর আমল করিতে চান। অবশিষ্ট ব্যবসায়িগণ ইহার উপর আমল করিতে চায় না। আপনি সুদের অঙ্ক দিতে চান না, কিন্তু প্রতিপক্ষ উহা লইতে চায়। আপনি সুদের অঙ্ক না দিলে সে মোকদ্দমা করিয়া উহা আদায় করিয়া লইবে।

উদাহরণতঃ, কোন সরকারী বিভাগে এক হাজার কর্মচারী রহিয়াছে। তন্মধ্যে মাত্র দুই-চারিজন নামাযের সময় কাজ করিতে চায় না। অবশিষ্ট সকলেই নামায নষ্ট করিতে রাযী। এমতাবস্থায় ঐ দুই-চারিজন লোকের পক্ষে অবশ্যই অসুবিধা দেখা দিবে। সকলেই নামায নষ্ট না করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইলে বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা নামাযের জন্য আইন রচনা করিতে বাধ্য হইবেন। তদ্রূপ অন্যান্য বিষয়েও বুঝিতে হইবে যে, যে কাজ সকলের করা উচিত তাহা অধিকাংশ লোকে না করিয়া মাত্র দুই-চারিজনে করার কারণেই শরীঅতের উপর আমল করা

www.BANGLAKITAB.com

অসুবিধাজনক হইয়া পড়িয়াছে। এখন আপনিই বলুন, এই সঙ্কীর্ণতার জন্য শরীঅত দায়ী, না আপনার জীবনযাপন পদ্ধতি?

বন্ধুগণ! এইরূপে সহজ হইতে সহজতর কাজও কঠিন হইয়া যাইবে। মনে করুন, খাওয়া কত সহজ কাজ। কিন্তু আপনি যদি এমন কোন গ্রামে পৌঁছিয়া যান, যেখানে আটা বিক্রয় হয় না, খড়িও কিনিতে পাওয়া যায় না এবং ভাল ঘি ইত্যাদি কিছুই পাওয়া যায় না। এমতাবস্থায় আপনি খাওয়া কঠিন বলিতে পারিবেন কি? কখনই নহে; বরং বলা হইবে যে, এই গ্রামের জীবনযাপন পদ্ধতি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। অথবা আপনি খাইতে চাহিতেছেন। কিন্তু দশজন ডাকাত আপনার মাথার উপর দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আপনি লোকমা উঠাইতেই তাহারা ছিনাইয়া লইয়া যায়। এমতাবস্থায় খাওয়াকে কঠিন বলা যাইবে না; সামাজিকতা সঙ্কীর্ণ বলা হইবে। ডাকাতদলের নিকট হইতে দূরে যাইয়া দেখুন—খাওয়া কত সহজ কাজ।

আমি আরও বলি, আপনি এমন কোন জায়গায় বসবাস করুন, যেখানে সকলেই শরীঅতের উপর আমল করে। এর পর দেখুন, শরীঅতে কতটুকু সঙ্কীর্ণতা আছে?

মনে করুন—চিকিৎসক রোগীকে দুই পয়সা মূল্যের ঔষধের ব্যবস্থাপত্র লিখিয়া দিল। ঔষধটি সস্তা ও সাধারণ হওয়ার কারণে সর্বত্রই পাওয়া যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে রোগীটি এমন অঞ্চলের অধিবাসী—যেখানে মামুলী ঔষধও পাওয়া যায় না। তাছাড়া চিকিৎসক রোগীকে বেগুন, করলা, মসুর ইত্যাদি মাত্র কয়েকটি জিনিস খাইতে নিষেধ করিল এবং পালং শাক, তরই, লাউ, মুগের ডাল, খাসীর গোশ্‌ত শালগমের আশ ইত্যাদি আট দশ প্রকার জিনিস খাইতে অনুমতি দিল। কিন্তু রোগীর অঞ্চলে এসব কিছুই পাওয়া যায় না। হাঁ, বেগুন, মসুর ইত্যাদি নিষিদ্ধ পথ্য প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় রোগী যদি বলে যে, এই চিকিৎসকের ব্যবস্থা খুবই সঙ্কীর্ণ কিংবা চিকিৎসা-শাস্ত্রই সঙ্কীর্ণতায় পরিপূর্ণ, তবে তাহার কথা কোন জ্ঞানী ব্যক্তি মানিয়া লইবে কি? কখনই নহে। সকলেই তাহাকে বলিবে, আরে বোকা, চিকিৎসা-শাস্ত্রে মোটেই সঙ্কীর্ণতা নাই, উহা অত্যধিক প্রশস্ত। উহাতে মারাত্মক রোগের চিকিৎসা হাজার হাজার টাকার বিনিময়েও করা যায়, আবার দুই-চারি পয়সা দামের ঔষধ দ্বারাও করা যায়। আসলে তোমার গ্রামই সঙ্কীর্ণ। উহাতে সাধারণ জিনিস পাওয়াও অত্যন্ত কঠিন।

ভাইসব, আপত্তি উত্থাপনকারীদের অবস্থাও তদ্রূপ। নিজেদের জীবন-পদ্ধতির সঙ্কীর্ণতা তাহাদের চোখে পড়ে না। অহেতুক শরীঅতের উপর সঙ্কীর্ণ ও দুরূহ হওয়ার দোষ চাপাইয়া দেয়। আমি কসম করিয়া বলিতেছি, শরীঅত অপেক্ষা সহজ আইন কোথাও পাওয়া যাইবে না। শরীঅতের আইনে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি পুরাপুরি লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। তবে যেক্ষেত্রে অধিকাংশ মুসলমান শরীঅতের উপর আমল করিতে অনিচ্ছুক; অধিকন্তু যাহারা আমল করে, তাহাদিগকেও বিরত রাখিতে সচেষ্ট, সেখানে এই সব ডাকাতদের কারণেই যতসব সঙ্কীর্ণতা অনুভূত হইবে। নতুবা প্রকৃতপক্ষে শরীঅতের নির্দেশাবলী যারপরনাই সহজ। সকলে মিলিয়া উহার উপর আমল করিলে জীবনযাত্রা অত্যন্ত সুখী ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নির্বাহ হইবে। হক তা'আলা বলেনঃ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا 'আল্লাহ্ কাহাকেও সামর্থ্যের বাহিরে কাজের ভার দেন না।' এমতাবস্থায় শরীঅতের নির্দেশাবলী মানুষের সামর্থ্যের বাহিরে বলিয়া কিংবা উহা সামান্যও কঠিন বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? খোদার বাণী কিছুতেই অসত্য হইতে পারে না। ইহাতে সন্দেহ পোষণেরও বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই।

www.BANGLAKITAB.com

এই বিষয়টি আমি অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতে পারি; কিন্তু কিছুদিন পূর্বে এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত ওয়ায করিয়াছিলাম। উহার নাম রাখা হইয়াছে, "নাফিউল হরয।" বর্তমানে উহা শীঘ্রই মুদ্রিত হইতেছে। প্রকাশক বলিয়াছেন যে, শীঘ্রই উহা প্রকাশ করা হইবে। ঐ ওয়াযে "ধর্মে সঙ্কীর্ণতা নাই"—এই দাবীটির সকল দিকই উত্তমরূপে প্রমাণিত করা হইয়াছে। ঐ ওয়ায-মহফিলে অনেক নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উহা শুনিয়া সকলেই মাথা নোয়াইয়া দেয় এবং স্বীকার করে যে, দাবীটি যথার্থই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। আমাদের বহু দিনকার পুঞ্জীভূত আপত্তিসমূহও দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক মুসলমানের ঘরে ঐ ওয়াযের এক এক কপি থাকা উচিত। বিশেষতঃ নব্য শিক্ষিত ভাইগণ এক কপি অবশ্যই রাখিবেন। কেননা, তাঁহাদের মনেই এই ধরনের আপত্তি বেশী মাথাচাড়া দিয়া উঠে। ধর্মের ব্যাপারে মনে কোনরূপ সন্দেহ থাকা খুবই মারাত্মক রোগ। খুব যত্ন সহকারে এই রোগের চিকিৎসা করা দরকার। খোদা চাহে তো ঐ ওয়াযে অনেক আপত্তি দূর হইয়া যাইবে।

মোটকথা, ধর্মকর্ম সর্বোত্তম কাম্য বস্তু। উহা লাভ করার উপায় নির্দিষ্ট। উহাতে কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা নাই; বরং অত্যন্ত সহজ ও সরল। এই উপায় অবলম্বন করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধিও নিশ্চিত। এক্ষণে ইহারই গূঢ়তত্ত্ব বর্ণনা করিতে চাই।

প্রতিফলের ওয়াদাঃ হক তা'আলা ধর্মকর্মে প্রতিফলের ওয়াদা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে সাংসারিক কার্যাবলীতে প্রতিফলের ওয়াদা দেন নাই। সাংসারিক কাজকর্ম সম্বন্ধে বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهٗ فِيْهَا مَانَشَآءُ لِمَنْ نُّرِيْدُ

"যে ব্যক্তি দুনিয়া উপার্জন করিতে চায়, আমি তাহাকে দুনিয়াতে যে পরিমাণ ইচ্ছা করি এবং যাহাকে ইচ্ছা করি দান করিব।" অর্থাৎ, পার্থিব ফলাফল লাভ হওয়া খোদার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। এখানে ওয়াদা নাই যে, যাহা চাহিবে তাহাই দেওয়া হইবে এবং যে-ই চাহিবে তাহাকেই দেওয়া হইবে; বরং খোদার ইচ্ছানুযায়ী, কতক লোকের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, কতক লোকের উদ্দেশ্য মোটেই পূর্ণ হয় না।

অপর পক্ষে আখেরাতের আমল সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا

"যে ব্যক্তি আখেরাত লাভ করার ইচ্ছা করে এবং মু'মিন অবস্থায় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে, তবে হক তা'আলা তাহাদের চেষ্টাকে মর্যাদা দিবেন।" আয়াতে اَرَادَ অর্থাৎ, ইচ্ছার পর سَعٰى لَهَا سَعْيَهَا অর্থাৎ, যথাযোগ্য চেষ্টার উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে যে, ইচ্ছা করার অর্থ শুধু মনে আকাঙ্ক্ষা করা নহে, বরং ইচ্ছা করার অর্থ হইল দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ হওয়া। ইহা চেষ্টা ব্যতিরেকে সম্ভব নহে। এর পর প্রতিফল স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে যে, اُولٰٓئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَّشْكُوْرًا 'তাহাদের চেষ্টা খোদার নিকট মর্যাদাপ্রাপ্ত হইবে।' শাহী পরিভাষায় এই বাক্যটি অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। কোন বাদশাহ্ স্বীয় খাদেমকে যদি বলে, আমি তোমার খেদমতের যথাযোগ্য সম্মান দান করিব, তবে খাদেমের মূল্যবান পুরস্কার লাভের আশা নিশ্চিত হইয়া যায়। সে বুঝিতে পারে যে, তাহাকে তাহার সেবা অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী পুরস্কার দেওয়া হইবে। দুনিয়ার সামান্যতম বাদশাহ্র এই ধরণের উক্তি হইতে যদি এতকিছু পাওয়ার দৃঢ় আশা নিশ্চিত হয়, তবে বাদশাহ্দের বাদশাহ্

www.BANGLAKITAB.com

খোদার এবম্প্রকার বাণী হইতে কতকিছু আশা করা যায়! রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই ফয়সালা করিতে পারিবেন। অন্যত্র আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْاٰخِرَةِ نَزِدْ لَهٗ فِىْ حَرْثِهٖ وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا

"যে ব্যক্তি আখেরাতের ক্ষেতি কামনা করে, আমি তাহাকে আরও বাড়াইয়া দেই এবং যে ব্যক্তি দুনিয়ার ক্ষেতি চায়, তাহাকে কিঞ্চিৎ দিয়া দেই।"

দুনিয়ার বেলায় نُؤْتِهٖ مِنْهَا অর্থাৎ, 'কিঞ্চিৎ দিয়া দেই' বলা হইয়াছে। এই ওয়াদা করা হয় নাই যে, সে যাহা চাহিবে তাহাই দেওয়া হইবে। অথচ আখেরাতের বেলায় বাড়াইয়া দেওয়ার ওয়াদা করা হইয়াছে। এই ওয়াদাকে ইচ্ছার উপরও নির্ভরশীল করা হয়। সুতরাং বুঝা যায় যে, আখেরাত লাভের ইচ্ছা করিলে উদ্দেশ্যই লাভ হইয়া যায়; বরং উদ্দেশ্য হইতেও বেশী পাওয়া যায়। সোবহানাল্লাহ্! এই বেশী শুধু আখেরাতেই দেওয়া হয় না; বরং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি দুনিয়াতেও আমল অপেক্ষা অনেক বেশী পুরস্কার পাইয়া থাকেন। তাঁহারা দুনিয়াতে এমন সব বস্তু পান, যাহা পূর্বে তাঁহাদের কল্পনায়ও ছিল না। আখেরাতে যাহা লাভ হইবে, মুসলমানগণ সাধারণতঃ তাহা জানে। তাহারা জানে যে, আখেরাতে আমল অপেক্ষা অনেক বেশী পুরস্কার পাওয়া যাইবে। সকলেই এই হাদীস শুনিয়াছেঃ

اَعْدَدْتُّ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالَاعَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَاخَطَرَ عَلٰى قَلْبِ بَشَرٍ

"আমি আমার নেক বন্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, যাহা কোন চক্ষু দেখে নাই, কোন কর্ণ শুনে নাই এবং কাহারও মনে উহার কল্পনাও জাগে নাই।" কিন্তু দুনিয়ার উন্নতি ও বৃদ্ধি সম্পর্কে অনেকেই জ্ঞাত নহে। অধিকাংশ মুসলমানের ধারণা, শুধু আখেরাতেই আমল অপেক্ষা বেশী পুরস্কার পাওয়া যাইবে, দুনিয়াতে আমলের পুরস্কার পাওয়া যায় না বা পাওয়া গেলেও অল্প, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। হক তা'আলা ধর্মীয় আমলের পুরস্কার দুনিয়াতেও ধারণাতীত পরিমাণে দান করিয়া থাকেন এবং তাহাও এত বিরাট হয় যে, কাহারও মনে পূর্বে ইহার কল্পনাও জাগে না।

আপনি হয়তো প্রশ্ন করিবেন যে, ঐ পুরস্কারগুলি কি? ইহার উত্তর এই যে, ধার্মিক হইয়া যান, নিজেই ঐ পুরস্কার লাভ করিতে পারিবেন। আমি ইহা বর্ণনা করিতে পারিব না, ইহার বর্ণনা সম্ভবও নহে। কারণ, পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মানুষ ঐ সবের কল্পনাও করিতে পারে না; সুতরাং এরূপ বস্তুর বর্ণনা কিরূপে সম্ভব? সত্য বলিতে কি, দুনিয়াতেও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ এমন নেয়ামত প্রাপ্ত হয়, যাহা বর্ণনা করার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য বুযুর্গানের উক্তি হইতে উপরোক্ত নেয়ামতসমূহের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় এবং নিশ্চিত লক্ষণাদি দ্বারা ইহার সত্যতা প্রমাণিত হয়। জনৈক বুযুর্গ বলেনঃ

لَوْ عَلِمَتِ الْمُلُوْكُ بِمَا عِنْدَنَا مِنَ النَّعَمِ لَجَادَلُوْنَا بِالسُّيُوْفِ

"আমাদের কাছে যে সব নেয়ামত রহিয়াছে দুনিয়ার বাদশাহ্‌গণ তাহা জানিতে পারিলে তলোয়ার লইয়া আমাদের উপর চড়াও করিত এবং তাহা ছিনাইয়া লইতে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করিত না।" ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহাদের নিকট এমন নেয়ামতসমূহ রহিয়াছে যাহার মোকাবিলায় সমগ্র পৃথিবীর রাজত্বও মূল্যহীন। কেননা, বাদশাহ্‌রা তাঁহাদের উপস্থিত ধনদৌলত হইতে উত্তম

www.BANGLAKITAB.com

জিনিসই লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন। আর ঐ নেয়ামত রাজত্ব অপেক্ষা হেয় হইলে তাহা লাভ করিতে তাঁহারা চেষ্টিত হইবেন কেন?

সুতরাং নিশ্চিতরূপেই উহা এমন নেয়ামত হইবে, যাহার নামগন্ধও বাদশাহ্‌গণ পান নাই। ইহা শুধু বুযুর্গদের মুখের কথাই নহে; বরং যিনি এই নেয়ামত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি দুনিয়ার রাজত্বকে লাথি মারিয়াও দেখাইয়া দিয়াছেন। ইব্‌রাহীম আদহাম (রঃ)-এর ঘটনা কাহারও অজানা নহে। খোদা তা'আলা যখন তাঁহাকে খাছ নেয়ামত দান করিলেন, তখন তিনি বিরাট সাম্রাজ্য ত্যাগ করিয়া ফকীরী অবলম্বন করেন; সুতরাং ইহা এইরূপ নেয়ামত যে, বুযুর্গগণ যাহার মোকাবিলায় সাম্রাজ্যকেও অত্যন্ত হেয় মনে করিয়া থাকেন। বাহ্যতঃ তাঁহাদের অবস্থা এইরূপ যে, তাঁহাদের পোশাক পরিচ্ছদ পরিপাটী থাকে না এবং শারীরিক আকৃতিতেও কোনরূপ শ্রী থাকে না। কিন্তু আন্তরিক দিক দিয়া তাঁহারা এত ধনী যে, রাজা-বাদশাহ্‌দিগের প্রতিও তাঁহারা ভ্রুক্ষেপ করেন না; রাজা-বাদশাহ্‌রা স্বয়ং তাঁহাদের গোলামী করাকে গৌরব মনে করেন। এই নেয়ামতের বর্ণনা প্রসঙ্গে সাধক শীরাযী বলেনঃ

مبیں حقیر گدایاں عشق را کیں قوم ــ شاهان بے کمر و خسروان بے کله اند

(মবী হাকীর গাদায়ানে এশ্‌ক্‌রা কি কওম + শাহানে বে-কমর ও খসরুয়ানে বে-কুলাহান্দ)

অর্থাৎ, 'খোদার আশেকদিগকে ঘৃণিত মনে করিও না। তাঁহারা কমরবন্ধ ও মুকুট ব্যতীতই সম্রাট সম্প্রদায় বিশেষ।' সাধক শীরাযী এই নেয়ামতের কিঞ্চিৎ সন্ধানও দিয়াছেনঃ

بفراغ دل زمانے نظرے بماه روئے ــ به ازاں که چتر شاهی همه روزها و هوئے

(ব-ফরাগে দিল্ যমানে নয্‌রে ব-মাহ্ রোয়ে
বেহ্ আঁযা কেহ্ চতরে শাহী হামা রোয হা ও হোয়ে)

প্রাণ খুলিয়া মা'শুকের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা অশান্তিপূর্ণ শাহী জৌলুস হইতেও উত্তম।

ইহাতে বুঝা যায় যে, হক তা'আলার প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ এবং তাঁহার সহিত পূর্ণ সম্পর্কই হইল এই নেয়ামত। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা লাভ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি বিমুখ হইয়া যায়। কেন হইবে না, যে অন্তরে খোদা বিরাজমান উহাতে অন্য জিনিস কিরূপে স্থান পাইতে পারে।

عشق آں شعله است که چوں بر فروخت ــ هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت
ماند الا الله باقی جمله رفت ــ مرحبا ایے عشق شرکت سوز رفت

(এশ্‌ক আঁ শো'লাস্ত কেহ্ চুঁ বর ফরোখ্‌ত্ + হরচেহ্ জুয মা'শুক বাকী জুমলা সোখ্‌ত্
মানাদ ইল্লাল্লাহ্ বাকী জুমলা রফ্‌ত্ + মারহাবা আয় এশ্‌ক শিরকত সূয রফ্‌ত্)

"এশ্‌ক এমন একটি স্ফুলিঙ্গ যে, উহা জ্বলিয়া উঠিলে মা'শুক ব্যতীত সব কিছুকেই জ্বালাইয়া দেয়। একমাত্র আল্লাহ্‌র নাম বাকী থাকে, বাকী সমস্তই ফানা হইয়া যায়। মারহাবা! হে এশ্‌ক! তোমার বদৌলতে গায়রুল্লাহ্‌র মহব্বত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।"

খোদার সহিত সম্পর্ক স্থাপনের উপায়ঃ ইহাকে এই নেয়ামতের মোটামুটি ও সংক্ষিপ্ত সন্ধান বলিতে হইবে। কারণ, ইহা দ্বারা খোদার সহিত পূর্ণ সম্পর্কের উপায় জানা যায় না। ফলে এই বিষয়ে অনেক ভুল-ভ্রান্তি হইয়া থাকে। অনেকে সর্বাবস্থায় খোদাকে স্মরণ রাখার ক্ষমতা

www.BANGLAKITAB.com

অর্জনকেই পূর্ণ সম্পর্ক মনে করে। আমারও কিছুদিন পর্যন্ত এইরূপ ধারণা ছিল। আল্‌হাম্‌দুলিল্লাহ্‌ এখন হক তা'আলা আসল স্বরূপ খুলিয়া দিয়াছেন। খোদার সহিত সম্পর্কের অর্থ হইল, উভয় পক্ষ হইতে সম্পর্ক হওয়া। শুধু বন্দার তরফ হইতে সম্পর্ক হইল, কিন্তু খোদার তরফ হইতে রহিল পর্দা, এইরূপ সম্পর্ক কাম্য নহে। মোটকথা, লোকেরা শুধু খোদাকে স্মরণ রাখাকেই উদ্দিষ্ট সম্পর্ক মনে করে, অথচ ইহা মশ্‌ক (অনুশীলন) দ্বারাই অর্জিত হইতে পারে।

আপনি খোদার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন এবং খোদাও আপনার প্রতি সন্তুষ্ট থাকিবেন, এইরূপ সম্পর্কই কাম্য। ইহা শুধু যিকর-আয্‌কারের মশ্‌কের দ্বারা অর্জন করা যায় না; বরং অধিক পরিমাণে যিকর করা, তৎসঙ্গে পাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকা এবং আনুগত্য প্রকাশ করাও শর্ত। পাপ কাজ হইতে আত্মরক্ষা না করিলে এবং আনুগত্য প্রকাশ না করিলে শুধু যিকর দ্বারা অভীষ্ট সম্পর্ক হাছিল হইবে না। অনেকেই যিকরের মশ্‌ক এবং সর্বদা খোদার ধ্যান লাভ হইতে দেখিয়াই নিজকে খোদার সহিত সম্পর্কযুক্ত মনে করিতে থাকে। ইহা ধোঁকা বৈ কিছুই নহে। গোনাহ্‌ করার পরও এই ধ্যান নষ্ট হয় না দেখিয়া, তাহারা আরও মনে করে যে, গোনাহ্‌ তাহাদের জন্য ক্ষতিকর নহে। অথচ ছুফীগণ বলিয়াছেন যে, গোনাহ্‌র ফলে বাতেনী সম্পর্ক দুর্বল হইয়া যায়। এর পর বার বার গোনাহ্‌ করিলে ঐ সম্পর্ক আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

কিছু সংখ্যক লোক আরও মারাত্মক ধোঁকায় পড়িয়া আছে। তাহারা মনে করে, সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর এমন এক স্তর আসে, যাহাতে সাহেবে নিস্‌বত ব্যক্তি শরীঅতের আদেশ-নিষেধের গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া যায়। তখন কোন হারাম তাহার পক্ষে হারাম থাকে না। স্মরণ রাখুন, ইহা পরিষ্কার ধর্ম বিকৃতি। যতক্ষণ জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় সঠিক থাকে, ততক্ষণ কেহই শরীঅতের আদেশ-নিষেধ হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

সুতরাং উভয় পক্ষ হইতে সম্বন্ধ হওয়াকেই প্রকৃত সম্পর্ক বলে। শুধু একতরফা সম্পর্ক হইলে তাহা নিম্ন বর্ণিত গল্পের ন্যায় হইবে।

জনৈক ছাত্রকে কেহ জিজ্ঞাসা করিল ঃ আজকাল কি চিন্তায় দিন কাটাইতেছ? সে উত্তর দিল ঃ শাহ্‌যাদীর সহিত বিবাহের চিন্তায় মশগুল আছি। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, এর জন্য কি আয়োজন করিয়াছ? উত্তর ঃ অর্ধেক আয়োজন সমাপ্ত হইয়াছে—আর অর্ধেক বাকী আছে। সে পুনঃ প্রশ্ন করিল, তা কিরূপে? উত্তর হইল, আমি তো রাযী আছি, কিন্তু শাহ্‌যাদি এখনও রাযী নহে।

এই ব্যক্তি যেরূপ নিজের রাযী হওয়া দ্বারাই অর্ধেক আয়োজন সমাপ্ত করিয়া বসিয়াছিল, উপরোক্ত ব্যক্তিদের অবস্থাও তদ্রূপ। বিবাহে একতরফা সম্মতি যেমন কোন মূল্য রাখে না, তদ্রূপ তাহাদের একতরফা সম্পর্কও না হওয়ারই শামিল। পূর্ববর্ণিত খাঁটি সম্পর্ক স্থাপিত হইলেই এমন তৃপ্তি লাভ হয়, যাহার সম্মুখে বিরাট সাম্রাজ্যও মূল্যহীন।

একদা সানজারের বাদশাহ্‌ গাওসে আ'যমকে এই মর্মে পত্র লিখিলেন যে, আমি হযরতের খান্‌কার যাবতীয় খরচাদির জন্য নিমরোয রাজ্যের এক অংশ দান করিতে ইচ্ছুক। হযরতকে উহা কবূল করিতে অনুরোধ করিতেছি। হযরত গাওসে আ'যম উত্তরে নিম্নোক্ত চৌপদী কবিতা লিখিয়া পাঠাইলেন ঃ

چوں چتر سنجری رخ بختم سیاه باد ـ در دل اگر بود هوس ملك سنجرم
زانگه كه يافتم خبر از ملك نيم شب ـ من ملك نيمروز بيك جو نمی خرم

www.BANGLAKITAB.com

(চুঁ চতর সানজারী রুখ বখতম সিয়া বাদ + দর দিল আগর বুয়াদ হওস মুল্‌ক সান্‌জারম যাঁগাহ্ কেহ্ ইয়াফতাম খবর আয মুল্‌কে নীম শব + মান মুল্‌কে নীমরোয ব-য়েক যও নমী খারাম)

'সানজার-শাহের রাজ্যের প্রতি যদি আমার লোভ হয়, তবে আমার ভাগ্যও যেন সানজার-শাহের পতাকার ন্যায় কাল হইয়া যায়। (তখনকার যুগে বাদশাহ্‌গণ কাল রঙ্গের পতাকা ব্যবহার করিতেন।) নীম্‌শব-রাজ্যের সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ার পর হইতে আমার অবস্থা এই যে, এখন সামান্য একটি যবের পরিবর্তেও নীমরোয রাজ্য ক্রয় করিতে রাযী নই।'

نيمروز و ملك نيم شب -এর মধ্যে আশ্চর্যধরনের صنعت تقابل রহিয়াছে। বুযুর্গদের কালামে বাতেনী শান-শওকত ছাড়া বাহ্যিক সৌন্দর্যও যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

জিজ্ঞাসা করি, এই বুযুর্গগণ কি কারণে রাজত্বের প্রতি এত বিমুখ হইয়া পড়িয়াছিলেন? মনে হয়, তাঁহারা দুনিয়াতেও এমন নেয়ামত প্রাপ্ত হন, দুনিয়াদারগণ যাহার কল্পনাও করিতে পারে না।

বন্দেগী ও অভিমানের স্তরঃ জনৈক দালাল (অভিমানী) পর্যায়ের বুযুর্গ ছিলেন—যালাল (গোমরাহ) পর্যায়ের নহে। 'দালাল' মা'রেফতী পরিভাষায় একটি বিশেষ অবস্থাকে বলে। যাহারা মা'রেফতী লাইনে মধ্যপথের পথিক, তাহাদের মধ্যে এই অবস্থাটি প্রকাশ পায়। কামেলদের মধ্যে এই অবস্থা দেখা যায় না। তাহাদের মধ্যে বিনয় ও দাসত্ববোধই প্রাধান্য বিস্তার করিয়া থাকে। হাঁ, যাহারা মধ্য পথের পথিক আনন্দের আতিশয্যে তাহাদের কাহারও কাহারও মধ্যে এই অবস্থা দেখা দেয়। তখন তাহারা অভিমানবশতঃ এমন সব উক্তি করিয়া ফেলেন, যাহা অন্যে বলিলে মারদূদ (খোদার দরবার হইতে বহিষ্কৃত) হইয়া যাইবে। মাওলানা বলেনঃ

ناز را روئے بباید همچو ورد ــ چوں نداری گرد بدخوئی مگرد
زشت باشد روئے نازیبا و ناز ــ عیب باشد چشم نابینا و باز
پیش یوسف نازش وخوبی مکن ــ جزنیاز و آه یعقوبی مکن

অর্থাৎ, অভিমান করার জন্যও (যোগ্য) মুখের দরকার। সকলের মুখই অভিমানের (যোগ্য) নহে। কেহ এই অবস্থা অর্জন করিতে পারিলে অভিমান করা তাহার পক্ষে শোভা পায়। এই অবস্থা অর্জিত না হইলে তাহার পক্ষে কান্নাকাটি ও অক্ষমতা প্রকাশ ব্যতীত অন্য কিছু শোভনীয় নহে। অভিমানীদের উক্তি খোদা কখনও কবূল করিয়া থাকেন, আবার কখনও তাহাদের কানও মলিয়া দেন।

এই বুযুর্গও দালাল পর্যায়ের ছিলেন। একদা দিবাভাগে তিনি এক শহরের পথে চলিতেছিলেন। শহরের প্রবেশদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি দারোয়ানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আরে ভাই, ব্যাপার কি, দিনের বেলায় শহরের দরজা বন্ধ কেন? তাহারা বলিল, বাদশাহ্‌র বাজপক্ষী উড়িয়া গিয়াছে। তাই তিনি শহরের দরজা বন্ধ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন—যাহাতে বাজ দরজার পথে বাহির হইয়া যাইতে না পারে।

ঘটনা শুনিয়া বুযুর্গ ব্যক্তি হাসি রোধ করিতে পারিলেন না, তিনি মনে মনে ভাবিলেন, মনে হয় বাদশাহ্ একেবারেই কাণ্ডজ্ঞানহীন। দরজার সহিত বাজের কি সম্পর্ক? সে পালাইতে ইচ্ছা করিলে স্বচ্ছন্দে আকাশ-পথে পালাইয়া যাইতে পারিবে। শহরের দরজা বন্ধ করিয়া বাজকে

www.BANGLAKITAB.com

কিরূপে রোধ করা যাইবে? অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া হাসিয়া হক তা'আলাকে বলিলেন, বেশ বোকাকে আপনি বাদশাহী দান করিয়াছেন! বাজ পক্ষী দরজা দিয়া যায়, না আকাশ-পথে উড়ে—সে ইহাও জানে না। পক্ষান্তরে আমি কত বুদ্ধিমান কিন্তু আজ আমার পায়ে জুতা নাই, পরনে ভাল পোশাক নাই। তৎক্ষণাৎ হক তা'আলার তরফ হইতে তাহার উপর তিরস্কারবাণী অবতীর্ণ হইল, "খুব ভাল কথা! আমি তোমাকেই বাদশাহী দান করিতেছি; কিন্তু পূর্বে জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার তত্ত্বজ্ঞান, বেলায়েত যাবতীয় গুণাবলী তোমার অভাব-অনটন সহ ঐ বাদশাহ্‌কে দান করিলে এবং তাহার বাদশাহী ও বোকামি ইত্যাদি তোমাকে দান করিলে তুমি তাহাতে রাযী আছ কি?"

এই তিরস্কার-বাণী শুনিয়া বুযুর্গের চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি খোদার প্রতাপে ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেজদায় পড়িয়া গেলেন এবং আরয করিলেন, আমি ভুল স্বীকার করিয়া তওবা করিতেছি। আর কখনও এরূপ ধৃষ্টতা করিব না। আমি যাহা লাভ করিয়াছি হাজার বাদশাহীর পরিবর্তেও তাহা দিতে রাযী নই।

কবি চমৎকার বলিয়াছেনঃ

رَضِيْنَا قِسْمَةَ الْجَبَّارِ فِيْنَا ـ لَنَا عِلْمٌ وَّلِلْجُهَّالِ مَالٌ
فَاِنَّ الْمَالَ يَفْنِىْ عَنْ قَرِيْبٍ ـ وَاِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَايَزَالُ

"আমাদের ভাগে এল্‌ম ও মা'রেফত এবং মূর্খদের ভাগে ধনদৌলত পড়িয়াছে। আমরা প্রতাপশালী খোদার এই বন্টনে খুবই সন্তুষ্ট। কেননা, ধনদৌলত সত্বরই ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং এল্‌ম ও মা'রেফতের ধ্বংস নাই।"

নেক আমলের পুরস্কার দুনিয়াতে পাওয়া যায় না বলিয়া যাহাদের ধারণা, তাহারা এই গল্পটিতে চিন্তা করুক। এই বুযুর্গ ব্যক্তি দারিদ্র্যের তাড়না বরণ করিয়া বাদশাহীকে লাথি মারিয়া দিলেন কেন? ইহা বিনা কারণে নহে। তিনি নিশ্চয়ই কোন অমূল্য নেয়ামত পাইয়াছিলেন, যাহা ছিনাইয়া লওয়ার কথা শুনিতেই তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। তিনি বাদশাহীর পরিবর্তেও উহা দিতে রাযী হইলেন না। বন্ধুগণ! খোদার কসম, যাঁহারা এই দৌলতের সন্ধান পাইয়াছেন, তাঁহাদের নেশার কোন অন্ত নাই। তাঁহারা বাদশাহীকে মশার ডানার সমানও মনে করেন না।

آں کس کہ تراشناخت جاں را چہ کند ـ فرزند و عیال و خانماں را چہ کند

(আঁকাস কেহ তুরা শনাখ্‌ত জাঁরা চেহ্ কুনাদ + ফরযন্দ ও এয়াল ও খানমাঁরা চেহ্ কুনাদ)

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি তোমাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাহার আবার পরিবার-পরিজন বাড়ী-ঘর ও আপন প্রাণের কি চিন্তা?"

প্রত্যেক কাজের উপায়ঃ মোটকথা, প্রমাণিত হইল যে, ধর্মীয় কাজের ফলাফল দুনিয়াতেও আমল অপেক্ষা অনেক বেশী পাওয়া যায় এবং নেক আমলের প্রতিদান স্বরূপ দুনিয়াতেও এমন এমন নেয়ামত লাভ হয়, যাহার মোকাবেলায় দুনিয়াদারদের নেয়ামত কোন মূল্য রাখে না। আর আখেরাতে নেক আমলের প্রতিদান লাভ সম্পর্কে তো কাহারও দ্বিমত নাই।

সুতরাং ধর্ম মকছুদ হওয়া স্থিরীকৃত। উহার উপায়ও অজানা নহে। আর ধর্মের উপায়ও অত্যন্ত সহজ এবং এই উপায়ে উদ্দেশ্যের সিদ্ধি লাভও সুনিশ্চিত। ইহাতে দুনিয়া ও আখেরাতে

www.BANGLAKITAB.com

আশাতীত প্রতিদান পাওয়া যায়। তাছাড়া আখেরাতের প্রতিদান চিরস্থায়ী এবং দুনিয়ার প্রতিদান ধ্বংসশীল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষ ধর্মের জন্য মোটেই তৎপর হয় না এবং উহার উপায়সমূহ অবলম্বন করে না। যাহারা সামান্য তৎপরতা দেখায়, তাহারাও শুধু আকাঙ্ক্ষা পর্যন্তই উহাকে সীমাবদ্ধ রাখে, কোন উপায় অবলম্বন করে না। অথচ দুনিয়ার ব্যাপারে উপায় অবলম্বন না করিয়া শুধু আকাঙ্ক্ষা করাকে সকলেই নির্বুদ্ধিতা ও পাগলামি মনে করে। জানি না, ধর্মের বেলায় কেন মানুষের বিবেক-বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। কিছুক্ষণ বুযুর্গদের সংসর্গে বসিয়া কিছু কাঁদাকাটি করিয়া লওয়া, আর ওয়ায শুনিয়া কিছু অশ্রু বিসর্জন করিয়া লওয়াকেই তাহারা তৎপরতা মনে করিয়া লইয়াছে। স্মরণ রাখুন, শুধু কাঁদাকাটি করিলে কিছুই হয় না। প্রত্যেক কার্যকে উহার নিয়মানুযায়ী করিতে হয়।

عرفی اگر بگریہ میسر شدے وصال ـ صد سال می تواں بتمنا گریستن

(ওরফী আগর বগিরয়া মুয়াস্‌সার শোদে বেছাল + ছদ সাল মীতাওয়াঁ ব-তামান্না গুরিস্তান)

"হে ওরফী! যদি শুধু কান্নাকাটি দ্বারা খোদাকে পাওয়া সম্ভব হইত, তবে ইহার আশায় শত বৎসর কাঁদিতেও প্রস্তুত।"

তাহাদের আকাঙ্ক্ষার উদাহরণ এইরূপ মনে করুন যে, কেহ বুযুর্গদের নিকট যাইয়া বলে, হুযূর! দো'আ করুন যেন আমার একটি ছেলে-সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অথচ এই সাহেব বিবাহই করেন নাই। এমতাবস্থায় তাহার ছেলে কিরূপে জন্মলাভ করিবে? তদ্রূপ ধর্মে কামেল হওয়ার জন্য বুযুর্গদের নিকট শুধু দো'আ চাওয়া এবং উহার উপায় অবলম্বন না করা অনর্থক কাজ নহে কি? মনে রাখুন, প্রত্যেক কাজ নিয়মানুযায়ী করিলেই তাহা সুসম্পন্ন হইতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ○

"তোমরা দরজা দিয়া ঘরে প্রবেশ কর।" যদিও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে এই আয়াতটি নাযিল হইয়াছে, তথাপি শব্দের ব্যাপকতার দিক দিয়া ইহার প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক। ধর্ম একটি ঘর। আর উহার দরজা হইল ঐ সমস্ত উপায় যাহা শরীঅত বর্ণনা করিয়াছে। এই সব দরজা দিয়া প্রবেশ করিলেই ধর্মরূপ ঘরে প্রবেশ করা হইবে। মাওলানা রূমী নিম্নোক্ত কবিতায় এই বিষয়টি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেনঃ

اُطْلُبُوا الْاَرْزَاقَ مِنْ اَسْبَابِهَا – وَادْخُلُوا الْاَبْيَاتَ مِنْ اَبْوَابِهَا

এই কবিতার প্রথম লাইন দ্বিতীয় লাইনের নযীর। অর্থাৎ, তোমরা যেরূপ রিযিক লাভের জন্য উহার নির্ধারিত উপায় অবলম্বন কর, তদ্রূপ ধর্মের বেলায়ও উহার উপায় অবলম্বন কর। আপনি ধর্মের কাজ আরম্ভ করিয়া দিন। খোদা চাহে তো দরজা আপনাআপনি খুলিয়া যাইবে। অতঃপর দ্বীনের প্রতিফলও আপনার হাছিল হইবে। ইহার এক ফল এই যে, ইহাতে খোদার সহিত আপনার সম্পর্ক স্থাপিত হইয়া যাইবে, জীবন মধুময় হইয়া উঠিবে। বাকী খোদা-প্রেমিকগণ অন্যান্য যে সব দৌলত লাভ করিয়া থাকেন, আমি উহাদের স্বরূপ আপনাকে বলিতে পারিব না। কারণ, ঐগুলি রুচিগত জিনিস। রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিগণই উহা বুঝিতে পারেন। ধর্মের কাজে লাগিয়া গেলে খোদা চাহে তো আপনিও এরূপ রুচি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এছাড়া যতই বুঝানো হউক, বুঝিতে পারিবেন না।

www.BANGLAKITAB.com

পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে হাজার বুঝাইলেও নারীর মিলন-সুখ অনুভব করিতে পারিবে না। হাঁ, যদি খোদার ফযল হয় এবং সে রোগমুক্ত হয়, তবে আপনাআপনি এই সুখ বুঝিয়া ফেলিবে, তখন কাহারও বুঝাইবার প্রয়োজন থাকিবে না। সুতরাং প্রথমে আপনি অনুভূতিহীনতার প্রতিকার করুন।

দ্বীন ও দুনিয়ার পার্থক্য ঃ প্রত্যেক রোগেরই ঔষধ আছে, তবে চিকিৎসা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী আমল করা শর্ত। দ্বীন ও দুনিয়ার মধ্যে আরও একটি পার্থক্য বুঝা যায়। তাহা এই যে, চেষ্টা তদবীর ছাড়াই দুনিয়ার উদ্দেশ্যাবলী লাভ হওয়া সম্পর্কে খোদার তরফ হইতে ওয়াদা আছে। হক তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَمَامِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا

"প্রত্যেক প্রাণীর রিযিকই খোদার জিম্মায়।" ইহা চেষ্টা-তদবীর ছাড়াও লাভ হইতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষ ইহা লাভ করার চেষ্টাকে জরুরী মনে করে। পক্ষান্তরে আখেরাতের ফলাফল চেষ্টা-তদবীর ছাড়া লাভ হইবে বলিয়া কোন ওয়াদা নাই। হক তা'আলা পরিষ্কার বলেন ঃ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا অর্থাৎ, "প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার আমলের প্রতিফল পাইবে। যেমন কর্ম করিবে তেমন ফল পাইবে।" আশ্চর্যের বিষয়! মানুষ তা সত্ত্বেও ধর্মের কাজে চেষ্টা করা জরুরী মনে করে না। এই পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া খোদা-প্রেমিকগণ পার্থিব উদ্দেশ্যাবলী লাভ করার চেষ্টা ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঃ জীবিকার দায়িত্ব হক তা'আলা গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং ইহার জন্য চেষ্টা তদ্‌বীর প্রয়োজন নাই। ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব আমাদের উপর ছাড়িয়া দিয়াছেন। সুতরাং তজ্জন্য আমাদের চেষ্টা-তদবীর করিতেই হইবে।

একদা জনৈক বুযুর্গ একজন ইমামের পিছনে নামায পড়িলেন। নামায শেষে ইমাম সাহেব বুযুর্গের সহিত দেখা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ 'আপনি কোথায় খাওয়া দাওয়া করেন? আপনাকে জীবিকার জন্য কোন কাজকর্ম করিতে দেখি না।' বুযুর্গ বলিলেন ঃ 'একটু অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব।' এই বলিয়া তিনি নামাযের নিয়ত বাঁধিয়া ফেলিলেন। সালাম ফিরাইয়া বলিলেন, এবার বলুন, আপনার কি প্রশ্ন? ইমাম সাহেব বলিলেন ঃ 'এখন আমার প্রশ্ন আরও একটি বাড়িয়া গিয়াছে। তাহা এই যে, আপনি দ্বিতীয়বার নামায পড়িলেন কেন? কিছুক্ষণ পূর্বেই তো নামায পড়িয়াছিলেন।' বুযুর্গ বলিলেন ঃ 'আমি পূর্বের নামাযই দোহ্‌রাইয়া পড়িয়াছি। কেননা, আপনার প্রশ্ন শুনিয়া আমার সন্দেহ হইল যে, বোধ হয় খোদার উক্তি وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا 'প্রত্যেক প্রাণীর রিযিকই খোদার যিম্মায়'-এর প্রতি আপনার বিশ্বাস নাই। ফলে আপনার ইমামতির ব্যাপারেই আমি সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিলাম। তাই আমি তাড়াতাড়ি নামায দোহ্‌রাইয়াছি। ইতিমধ্যে মৃত্যু আসিয়া পড়িলে নামাযটি আমার জিম্মায়ই থাকিয়া যাইত। (ইহা হালের প্রাধান্য বৈ কিছুই নহে)

অতঃপর বলিলেন, আরে ভাই, উপার্জনের উপরই কি রুযী নির্ভর করে? অথচ খোদা তা'আলা বলিয়াছেন, রুযী আমার যিম্মায়। এরপরও আপনার মনে এই প্রশ্ন উদয় হইল কেন? তবে খোদার এই উক্তির উপর আপনার আস্থা নাই? ইহাতে ইমাম সাহেব খুবই লজ্জিত হইলেন।

অন্য একজন বুযুর্গ বলেন ঃ দুনিয়া খোদার ঘর। আমরা এখানে মেহ্‌মান। হাদীসে বলা হইয়াছে ঃ اَلضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ "তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা উচিত।" সুতরাং আমরাও